পার্বত্য তথ্য কোষ

৯

১ গবেষণা পত্র
২ ইতিহাস
৩ রাজনীতি
৪ চুক্তি ও ভূমি সমস্যা
৫ শান্তি সূত্র
৬ প্রতিবেদন গুচ্ছ
৭ অনুসন্ধান
৮ নির্বাচিত রচনাবলী
৯ তথ্য উপাদান
১০ রচনা সমগ্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মরহুম আতিকুর রহমান লিখিত 'পার্বত্য তথ্যকোষ' ০১ সেট বই তাঁর ছেলে ফয়জুর রহমান ফয়েজ এর পক্ষ থেকে উপহার সরুপ।

প্রয়োজনে মোঃ ০১৬১২-২৮০৮০২

পার্বত্য তথ্য কোষ -৯

তথ্য উপাদান

আতিকুর রহমান

নিবন্ধন পত্র

বই : পার্বত্য তথ্য কোষ ১-১০

লেখক : আতিকুর রহমান

প্রকাশক : পর্বত প্রকাশনী
৪৮ সাধার পাড়া, উপশহর সিলেট

প্রকাশ কাল : নভেম্বর ২০০৭ ইং

কম্পোজ : বাবুল কম্পিউটার/ইমন কম্পিউটার ও সোলেমান খাঁ
২৬২/ক ২৬২ বাগিচা বাড়ী ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।

পেষ্টিং : আবু তাহের ঐ

মুদ্রাকর : বি.এস.প্রিন্টিং প্রেস ২ আর কে. মিশন রোড মতিঝিল
: মোতালেব ম্যানসন ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ : শিল্পী আরিফুর রহমান ১৩১ ডিআইটি রোড ঢাকা।

পরিবেশক : ১ রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার রাঙ্গামাটি
২. মল্লিক বই বিতান ঐ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ রিসার্চ ফোরাম
৫/১৮, নূরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মূল্য : খণ্ড-১, ৩ ও ৯ টাকা ১৩০/- খণ্ড-১০ টাকা ৫০০/-
অন্যান্য খণ্ড - টাকা ১০০/-

যোগাযোগে : আতিকুর রহমান মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮

পার্বত্য তথ্য কোষ
খণ্ড -৯ঃ তথ্য উপাদান

সূচী পত্র ঃ

ক) প্রত্ন বস্তু ঃ

খ. ইতিহাস ও রাজনীতি সূত্র ঃ

ভূমিকা ঃ

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয় অধিবাসীদের ব্যাপারাদি সঠিকভাবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে না। এ সংক্রান্ত প্রথম ভুল হলো ঃ এই অবাঙ্গালী লোকজনকে স্থানীয় আদি স্থায়ী অধিবাসী রূপে জ্ঞান করা হয়, এবং এতদাঞ্চলকেও মনে করা হয় অবাঙ্গালী অঞ্চল। এটাই স্থানীয় তথ্য রূপে রাজনীতি বিজ্ঞানের শক্ত ভিত্তি হয়ে এতাদাঞ্চলীয় সমস্যা সংকটের পরিপোষন করছে। নৃবিজ্ঞান মতে ও স্থানীয় উপজাতীয়রা বাঙ্গালী নয়, পৃথক এক জাতিসত্তা, যারা নিজেদের এই আবাসস্থলে বহিরাগত সংখ্যাগুরু এবং এখানে তারা স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। নিজেদের আধিপত্য ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তারা বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ বিরোধী।

কোন জাতির অধিকারগত মূল ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখে তাকে কখনো কোথাও দমান যায়নি; বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক আমলের পরে আজকাল এমনটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানবধিকার মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রের নামে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সর্বত্র সবার কাছে সমর্থিত। তবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্য এবং উচ্চাভিলাষের দ্বারা কোন অঞ্চল গ্রাস ও কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দ্বারা মানবিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তিকে বিঘ্নিত করা আকাঙ্খিত নয়। আত্মরক্ষার এ পথটি এখনো অবারিত আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিপক্ষে বাংলাদেশ এখন অবরুদ্ধ। এ ব্যাপারে চুক্তি ও বিধিবিধান হয়েছে ঃ এতদাঞ্চল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, এখানে তাদের কিছু অগ্রাধিকার প্রাপ্য, কিছু উচ্চপদ তাদের জন্য সংরক্ষিত। বাঙ্গালীদের অবাধ ভূম্যাধিকার, ভোটাধিকার ও জনপ্রতিনিধিত্ব এখানে নিয়ন্ত্রিত।

এই স্বীকৃতি ও চুক্তি হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পথে মূল্যবান অগ্রগতি, যা বিশ্ব সমাজের কাছে অঙ্গিকার বিশেষ। সোজাসুজি এর ভিন্নতা করার উপায় নেই। বিশ্ব সমাজ কর্তৃক বাংলাদেশকে উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দানে বাধ্য করার পক্ষে এটি এক মাইলফলক। পার্বত্য চুক্তি ভঙ্গ করা হলে, বাংলাদেশকে শান্তি ভঙ্গ, অধিকার হরণ ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে।

উপজাতিদের নিত্যদিনের রাজনৈতিক কৌশল অভিনব। চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত মন্ত্রী, এমপি, রাজা, চেয়ারম্যান পদ উচ্চ বেতন ভাতা, গাড়ীবাড়ি বিলাসী সুবিধার কিছুই যথেষ্ট নয়। এগুলো এ পর্যন্ত তাদের সন্তুষ্ট করেনি। এ পথে উপজাতীয় পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা কামনা বাস্তব নয়। আসলে তারা উচ্চাভিলাষী বহিরাগত বংশোদ্ভূত লোক। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তারা আগ্রহী নয়। এদের পালন পোষন ও সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দান বিড়ম্বনাকর। সর্বোপরি

এরা বাংলাদেশের মূল নাগরিক বাঙ্গালীদের ও দেশের এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে এতদাঞ্চলে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়।

স্থানীয় সরকারি প্রশাসন আর প্রতিরক্ষাকেও উপজাতীয় করণে তারা উদ্বুদ্ধ। এসবই ধৃষ্টতাপূর্ণ রাজনৈতিক উচ্ছাকাঙ্খা। এই বাড়াবাড়ি অসহনীয়। এতে তাদের সহ দেশ ও জাতির এক হয়ে থাকার কোন অবকাশ নেই। বৃটিশ আমলে এদের পূর্বপুরুষেরা এতদাঞ্চলে উদ্বাস্তু রূপে এসেছিলো। ঐ বৃটিশরাই তাদের হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েলভূক্ত অভিবাসন আইন ৫২ বলে বাংলাদেশবাসীর অনুমোদন ছাড়াই এতদাঞ্চলে স্থান দিয়েছে। এখনো তারা চরিত্রে মননে বিদেশী ও বিজাতীয় থেকে গেছে। তারা বাংলাদেশী ও বাঙ্গালী স্বজন হতে পারেনি। এদের মাঝে সর্বাধিক উগ্র অবাধ্য আর বৈরী সম্প্রদায় হলো চাকমারা। এরা দেশ দ্রোহে অন্যান্য সহযোগীদের প্ররোচনা দাতা গুরু।

উপজাতীয়দের দুর্বল রাজনৈতিক ভিত্তি হলো তারা বৃটিশ আমলের বহিরাগত অভিবাসী জন গোষ্ঠী, প্রশ্নাতীত ভাবে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা নয়। তাদের অভিবাসন এদেশবাসীর দ্বারা অনুমোদিত নয়। ১৯৭২ সালে অবাধ্যতার কারণে পাকিস্তান প্রদত্ত বিহারী অভিবাসন বাতিল হয়েছে। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৯০০/১ রেগুলেশন ভুক্ত ৫২ নম্বর অভিবাসন আইনটিও কার্যকর নেই। যেহেতু এই উভয় সম্প্রদায়ই দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে দেশকে বিচ্ছিন্ন আর অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতাদান ও চুক্তি করা সত্ত্বেও বৈরী উপজাতীয়রা দেশের মূল অধিবাসী বাঙ্গালীদের বিতাড়নে এখনও সক্রিয় আছে। সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজী অব্যাহত রেখেছে। সেহেতু এই ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার শাস্তি হওয়া অন্যায় কিছু নয়। অস্ত্রবাজি গণহত্যা আর বাঙ্গালী প্রত্যাহারের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এমন এক গুরুতর অপরাধ যার প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও জাতি কর্তৃক তারা বৈরী ঘোষিত হতে পারে। তাদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কর্মসংস্থান রহিত, অভিবাসন ও নাগরিক অধিকার বাতিল হওয়া অন্যায় কিছু নয়।

এমন দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধের উপায় হলো : তাদের অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তৎপর আনুগত্যের প্রমাণ দেয়া, যাতে মানবতাবাদী সুযোগ সুবিধা মঞ্জুর করা সম্ভব হয়। দেশ বৈরী এই অভিযুক্তদের বিদেশী শক্তির কাছে এমন সুযোগ লাভের জন্য তদবিরে সক্রিয় হওয়া ও সুফল লাভের অপেক্ষা করাটাও অপরাধ। বিদেশী মুরব্বী রাষ্ট্রসমূহ তাদের পক্ষে এসে হস্ত ক্ষেপ করবে, এই আশাবাদ ধৃষ্টতা।

বিহারী আর পার্বত্য বিদ্রোহী উপজাতীয়রা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। বৈরীরূপে তাদেরকে পালন পোষণের কোনো সুযোগ নেই। অপরাধবোধ, দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনাতেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সূত্র নিহিত। তাছাড়া তাদেরকে নাগরিক রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে অপরাধে অভিবাসী বিহারীরা দুর্ভাগ্যজনক শিবির জীবনযাপনে এখন বাধ্য, তার চেয়ে অধিক গুরুতর অপরাধে দ্বিতীয় অভিবাসী জনগোষ্ঠী উপজাতীয়রা সমান শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তবে ক্ষমা ও মানবিক সেবা তাদের প্রাপ্য। সে জন্য তাদেরকে অপরাধবোধ দোষ স্বীকার ক্ষমা প্রার্থনা ও আনুগত্যের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হতে হবে। কোন ক্রমেই অযাচিতে ক্ষমা আর সুবিধাবাদ মঞ্জুরযোগ্য নয়।

পার্বত্য চুক্তি একটি বিরাট উদারতা, উপজাতীয়রা যার অপব্যবহার করছে, বাংলাদেশ তার অসহায় অনুকারক। এর নেতিবাচক প্রভাব অবশ্য বিবেচ্য। চুক্তির প্রথম ও প্রধান অঙ্গিকার হলো বাংলাদেশ সংবিধান অনুসরণ। অথচ প্রথম দফাতেই তা লঙ্ঘনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই লঙ্ঘনকে উভয় পক্ষের কেউই আমলে আনছেন না। তাতে চলমান সাংবিধানিক প্রক্রিয়াতেই সব অসাংবিধানিক চুক্তি বিধিবিধান ক্রিয়া প্রক্রিয়া আপনা আপনি রহিত ও বাতিল হয়ে গেছে, যথা ঃ অনুচ্ছেদ নং-৭ (১) ও (২), ২৬ (১) ও (২)। চুক্তিতে সংবিধান আর অলঙ্ঘনীয় অন্যান্য মৌলিক অধিকার আইনগুলো পর্যন্ত অক্ষুণ্ন নেই। রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র বিধৃত ধারা নং-১ এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত ধারা নং-৫৯ চুক্তি ভুক্ত আইনে বিকৃত হয়েছে। অথচ কোন কর্তৃপক্ষই এরূপ করার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত নন। এটি যথেচ্ছাচার।

মনে হয় ক্ষমতার শীর্ষাসীন ব্যক্তিরা পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতীয়দের নিয়ে বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। এ অবাঙ্গালীরা অস্থানীয় না স্থানীয়, দেশীয় নাগরিক না বিদেশী বংশোদ্ভুত, এ ব্যাপারে তাদের কোন সঠিক ধারণা নেই। তাই তাদের দ্বারা বৈরী উপজাতীয়দের নিয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে না।

এমনটি হওয়ার মূল কারণ ধরণা ও তথ্যগত অজ্ঞতা অবশ্যই। উপজাতীয়দের ধারণা ও কার্যক্রম চরমপন্থী। তারা পার্বত্য অঞ্চলকে বাঙ্গালী মুক্ত আর নিজেদের প্রশাসিত রাজ্যে পরিণত করতেই আগ্রহী। বাঙ্গালী আবাসন ও সেনা মোতায়েনকেও তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ভাবে। জনপ্রাধান্য ও বর্ধিত সুযোগ সুবিধা বলে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার পথেই তারা অগ্রসরমান। এই এলাকা চিরকালীন বাংলা অঞ্চল, যার আদি অধিবাসী হলো চট্টগ্রামী মূলের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী। দুর্গম পাহাড় ও বনাঞ্চল এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চল থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। সরকারও এতদাঞ্চলকে জাতীয় বনভূমি হিসেবে ঘোষণা করে এতদাঞ্চলকে করে রেখেছে জনবসতি মুক্ত। এই সুযোগে সীমান্ত দেশীয় জুমজীবী উপজাতীয় লোকেরা কেবল বর্ষাকালে ভ্রাম্যমান জুম কৃষিতে এতাদঞ্চলে নিয়োজিত হতো এবং পরে ফেরতও চলে যেত। তারা ছিল বহিরাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। এখনো তাদের মূল জাতি ত্রিপুরা মিজরাম ও আরাকান অঞ্চলের স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বসবাস করছে এবং ঐ তিন এলাকাই তাদের চিরকালীন জাতীয় অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো তাদের একদল শরণার্থী লোকের অভিবাসিত এলাকা। এখনকার স্থানীয় উপজাতীয়রা ঐ শরণার্থীদেরই বংশধর। স্থানীয়ভাবে তাদের আদি ও স্থায়ী সংখ্যাগুরু হওয়ার দাবী সঠিক নয়। এই লোকজনদের পিতৃপুরুষদের আদি স্বদেশ ত্যাগ চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগমন ও আশ্রয় গ্রহঁণ এবং পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন ১৯০০/১ এর অভিবাসন আইন নং-৫২ বলে এই অঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণ সম্পূর্ণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, যা এদেশবাসী কর্তৃক অনুমোদিত নয়। সেই ঔপনিবেশিক দখল, শাসন ও বিধি ব্যবস্থার কোন স্থায়ীত্বও নেই। স্বাধীনতার পর সে পরিস্থিতিও বিদ্যমান নেই। নিজেদের স্থানীয় ক্ষমতা বলে সেই অতীত বিদি ব্যবস্থা বিলোপের অধিকার বাঙ্গালীদের অবশ্যই আছে। এখানে প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য হলো সংশ্লিষ্ট লোকজনের শান্তি অনুসরণ না করা, আনুগত্য হীনতা অবলম্বন, মূল অধিবাসী বাঙ্গালীদের চ্যালেঞ্জ করা, এগুলো কোনো মতেই

অবহেলা যোগ্য নয়। নতুবা তাদের পক্ষে বাঙ্গালী মন জয় করা অসম্ভব হতো না। এমনটি করা তাদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিলো। নিজেদের সে কর্মফল তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বাঙ্গালী মানেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র। বাংলাদেশী জাতি তথা বাঙ্গালী ছাড়া এ দেশ ও জাতি কল্পনীয় নয়। এই নাম বিধৃত লোক সত্তা ও পরিবেশই এই দেশের জাতি শক্তি ও অস্তিত্বের ভিত্তি। এই মৌলিকত্বের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য থাকা প্রশ্নাতীত। খাঁটি বাংলাদেশী হওয়ার উপায় এই আস্থা ও আনুগত্যের প্রশ্নে সন্দেহমুক্ত হওয়া। এই সন্দেহটি মূলতঃ অতীত ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত, যা এ পর্যন্ত বিশদভাবে আলোচিত পর্যালোচিত ও অধিত হয়নি। এই তথ্য শূন্যতাকে দখল করে নিয়েছে কিছু আজগৌবী উপজাতীয় কথা কাহিনী, রূপকথা ও বানোয়াট গাল গল্প, যার বক্তব্য হলো উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের তিন রাজ পরিবার মূলত তিন স্থানীয় শাসক, বাঙ্গালীরা এখানকার স্থায়ী আদি বাসিন্দা নয় বহিরাগত। উপজাতীয়রা সরল নিরীহ বিধায় বাঙ্গালীদের দ্বারা ঘোষিত আর নির্যাতিত। তারা আত্মরক্ষার্থেই অস্ত্র ধারণে বাধ্য হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, নিজেদের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা। এর লক্ষ্য অবাধে বাঙ্গালী উচ্ছেদ নয়।

এখানে এ প্রশ্নগুলোর যথার্থতা যাচাই হওয়া আবশ্যক। নয়তো বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীরা অপরাধী হয়ে থাকবে। প্রকৃত পক্ষে নির্দোষ ও নিরপরাধ কে? বাঙ্গালী বাংলাদেশ না উপজাতীয়রা? এ প্রশ্নে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত বিভ্রান্তিকে তাত্ত্বিকভাবেই কাটান জরুরী। দেশবাসী সাধারণ লোকতো বটেই, জ্ঞানী গুণীদের বিপুল সংখ্যক লোক পর্যন্ত এই প্রশ্নে সন্দেহমুক্ত নন। বিদেশীরাও এই বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। এই লোকজনদের ধারণা : স্থানীয় সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র জাতি সত্তা সমূহ স্থানীয়ভাবে শান্তিতে নেই। বাংলাদেশে তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারে ঘাটতি আছে। যে জন্য তারা অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ। তারা প্রকৃতই বাংলাদেশী তবে অধিকার বঞ্চিত সংখ্যা লঘু। এদের পৃষ্ঠপোষণ দরকার।

এ কারণেই উপজাতীয় সংখ্যালঘু প্রশ্নে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চাপাধীন আছে। সুতরাং তাকে তথ্যগতভাবে আগে দেশে বিদেশে দায়মুক্ত হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতীয় লোক সংক্রান্ত তথ্যচর্চার ব্যাপারে বাংলাদেশ উদাসীন। তাকে প্রমাণ করতে হবে এই লোকজনেরা বৃটিশ আমলেরই বহিরাগত শরণার্থী বংশধর, স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়। ১৯০০ সালের পরে রচিত ও জারীকৃত পার্বত্য শাসন আইনের ৫২ ধারাই তাদের এতদাঞ্চলে অভিবাসন গ্রহণের আইনী প্রমাণ, যে আইন দেশীয় নয়, ঔপনিবেশিক।

ঔপনিবেশিক দখল ও রাজ্য বিস্তার, বার্মা কর্তৃক আরাকান দখল ও লোক বিতাড়ণ, দক্ষিণ পূর্ব বাংলা অঞ্চল চট্টগ্রামে ঐ আরাকানী শরণার্থী জনগোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচ্য। ঐ লোকগুলো লুসাই, ত্রিপুরা, চাকমা, মগ ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত। ঐ আগ্রাসন ও উদ্বাস্তু জনিত বিরোধ শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বার্মার মধ্যকার ১৮২৪ সালে সংগঠিত যুদ্ধে পরিণত হয়। তাতে আরাকান ও আসাম, বৃটিশ দখলাধীন হয়। এবং বার্মা, আসাম, আরাকান ও বাংলা হয়ে যায় একক বৃটিশ শাসনাধীন উপনিবেশ, যার অধিবাসীরা বৃটিশ প্রজা। এই বৃটিশ প্রজা হওয়া সূত্রে ভারতীয় বর্মী আসামী আরাকানী বাঙ্গালী আদিবাসী উপজাতি ইত্যাদি পরিচয়ের মৌলিকত্ব

ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। পরে আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে দেয়া হলেও, একক বৃটিশ শাসনের ঘোলাটে পরিস্থিতির অবসান ঘটেনি। বার্মা, আরাকান, আসাম ও বাংলাদেশ স্বতন্ত্র হলেও এসবের অধিবাসী বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী অভিবাসন ত্যাগ করে স্বদেশে ফেরত যায়নি। এরই ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রিপুরা, লুসাই, আরাকানী, মগ, চাকমা, বার্মী ও ভারতীয়রা স্থায়ী হয়ে পড়েছে। এতদাঞ্চলে তারা সংখ্যা গুরুও বটে, যার ফলে তারা এখন স্বশাসন, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীদার। তবে বাংলাদেশের প্রধান জাতি বাঙ্গালীদের বৈরী ভাবায় এ অধিকারগুলো তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য।

আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য স্বতস্ফূর্ত। স্বাধীনতার পর ঔপনিবেশিক মিশ্র পরিচয়ের অবসান ঘটেছে। এমন বর্মী আদিবাসী, উপজাতি আসামী মগ, চাকমা, বাঙ্গালী ইত্যাদি স্বতন্ত্র পরিচয় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। লোকদের ভিন্ন অবস্থান ভিন্ন অঞ্চলে অনাকাঙ্খিত হওয়া শুরু হয়েছে। এই বিরূপ পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক শাসকেরা নিজেদের আমলেই বহিরাগত প্রীতি ভাজনদের অভিবাসনের ছত্রছায়া দান করেন এবং অনেককে আবাসন গড়ে দিয়ে যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম এরূপই এক বহিরাগত উপজাতীয় উপ-নিবেশ। উপজাতীয় রাজনৈতিক দাবীর কৃত্রিমতার ইতিহাস বার্মা আরাকান ও বৃটিশ দলিল পত্রের মাধ্যমে এখনো জাজ্বল্যমান হয়ে আছে। এখানে ঐ অতীত ইতিহাসকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং বিদ্রোহী উপজাতিদের প্রকৃত ইতিহাস অবহেলা করা হয়েছে। অথচ বিষয়টি এখন অত্যন্ত গুরুতর। উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি বাসিন্দা ও সংখ্যাগুরু মান্য হলে, এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, তাদের নিজেদের এই আবাস ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দুষ্প্রাপ্য নয়। এই অঞ্চলে বাঙ্গালী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধে বাঙ্গালী বিতাড়ন ও নির্মুলকরণ আন্দোলন, তাই ঐ উপজাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারেরই অংশ। সুতরাং বিপদকে ঘনিয়ে তোলার পরিবর্তে উপজাতীয়দের দাবীকে হাল্কা করতে হবে। বাংলাদেশের অমোঘ অস্ত্র হলো ইতিহাস। তাতেই প্রমাণিত তারা বিদেশী বহিরাগত অভিবাসী জনগোষ্ঠী। স্বশাসন স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য নয়। বিদ্রোহজনিত অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া তাদের রেহাই নেই। চুক্তি সম্পাদন নমনীয়তা প্রদর্শন ও বিভিন্ন অধিকার প্রদান বিরোধীয় বিষয় নয়। এগুলো নাগরিকদের প্রাপ্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। বিদ্রোহীরা তার সুবিধা পেতে পারে না।

উপজাতীয়রা চরমপন্থী। তাদের ৫ দফা দাবী নামার দফা নং ৩(১) ৪ক ও খ-তে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা গুরুতর আপত্তিকর ও ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং অনাকাঙ্খিত। এই উচ্চাকাঙ্খার বিষয়ে বাংলাদেশের নমনীয় হওয়া মানে নিজের সর্বনাশ সাধন। দাবীটি যে কী সর্বনাশা তা তার ভাষ্যেই বিধৃত, যথা :

"দাবী নং ৩(১) ১৭ই আগস্ট ১৯৪৭ হইতে বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়ই বিভিন্ন স্থান ও গুচ্ছ গ্রামে বসবাস করিতেছে, সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া।

৪(ক) ঃ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বিডিআর) ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা সামরিক বাহি-নীর সকল ক্যাম্প ও সেনা নিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

৪(খ) ঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা যুদ্ধাবস্থা কিংবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনা বাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনা নিবাস স্থাপন না করা।

এই দাবীগুলো চরম বিদ্রোহাত্মক। একে পাকাপোক্ত করেছে সশস্ত্র কার্যক্রম। এই বিদ্রোহী অবাধ্য জনগোষ্ঠীকে বুঝতে দেয়া উচিত : তাদের প্রাপ্য হলো চরম শাস্তি। প্রথমতঃ তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তার বিপণ্ন শিশুকালে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী বাঙ্গালীদের প্রচুর প্রাণহানি ও রক্তপাত ঘটিয়ে তাদের স্বদেমের এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়ণে সচেষ্ট। এবং সর্বেপরি তারা বিদেশগত অভিবাসী লোক, আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়। এই ইতিহাসকে পাল্টে তারা এই অঞ্চলে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। সুতরাং তাদেরকে দমিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। এর বিকল্প হলো : তারা দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নতুবা তাদের জাহান্নামে যাওয়া অবধারিত।

অবাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা, ধারণা ও তথ্যগতভাবে, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী বিরোধী। তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার লক্ষ্য অর্জনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪টি সশস্ত্র বিদ্রোহ। তাদের প্রতি চরম উদারতা ও নমনীয়তার উদাহরণ হলো আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত পার্বত্য চুক্তি। তবু তারা তাতেও সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ বলা যায় না। সব দান, অনুদান, দয়া দাক্ষিণ্য, অগ্রাধিকার ও ক্ষমাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। বড় বড় গাড়ি বাড়ি, মাসোহারা বৃথাই বিলান হচ্ছে। এর অর্থ হলো বিষয়টির প্রতি রাষ্ট্রীয় ও বহিরদেশীয় মূল্যায়ন সঠিক নয়। উপজাতি সংক্রান্ত পূর্ব আশাবাদ ধ্যান ধারণা ও তথ্য ভিত্তি ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটাই সঠিক তথ্য যে, পার্বত্য উপজাতিরা স্থানীয় আদিবাসিন্দা নয়। ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটিশদের দ্বারা তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসিত, যথা হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ১৯০০/১ ধারা নম্বর ৫২, এবং ব্রিটিশ বার্মা যুদ্ধ ১৮২৪ এর কার্যকারণ সমূহ। এখন ধারণা ও তথ্যগত ভুল সংশোধন আবশ্যক। তাহলেই উপজাতিসহ দুনিয়াবাসী প্রকৃত ভুলের ব্যাপারে সচকিত হবে, এবং এ ধারণাও জন্ম নিবে যে উপজাতিদের রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের স্থানীয় সংখ্যা প্রাধান্য উদ্বাস্তু সমস্যাজাত কৃত্রিম। বাংলা রাষ্ট্র পক্ষের দুর্ভাগ্য যে সঠিকভাবে উপজাতীয় অতীত সন্ধান করা হচ্ছে না। এর ভিতর একমাত্র ব্যতিক্রম হলো স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক গিরিদর্পণ ভিত্তিক কিছু ধারাবাহিক তথ্যালোচনা, যার লেখক এই অভাগা ব্যক্তি, যিনি অশেষ দুঃখ কষ্ট অনুসন্ধান ও অভাব অসুবিধার ভিতর প্রতিপক্ষের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে স্বদেশ স্বার্থকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এই পরিশ্রমের বিপুল আর্থিক মূল্য তো আছেই, তবে তার ব্যয় নির্বাহে দেশ ও জাতির কোন অবদান নেই। এই সব তথ্য উপাত্তকে কাজে লাগিয়ে জাতি ও দেশ পার্বত্য সংকট থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে। জাতি ও দেশে এই তথ্য উপাত্ত যথার্থভাবে মূল্যায়িত হলে প্রতিপক্ষ নীতিগতভাবে দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য। তাই চলমান পার্বত্য সংকটের সমাধানের পক্ষে তথ্য উপাত্তের চর্চা যথার্থ মূল্যায়ন ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের পক্ষে প্রথম সাহসী পদক্ষেপ হলো পাকিস্তানী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয় সাহসী পদক্ষেপ হলো ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহারের দাবী বাস্তবায়ন। তৃতীয় সাহসী পদক্ষেপ হলো ঃ পাকিস্তানী দোসর বিহারীদের বৈরী ঘোষণা ও তাদের নাগরিকত্ব বাতিল ও ক্যাম্পে আবদ্ধকরণ। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আর বাঙ্গালী আধিপত্য তৎপর ও বিপদমুক্ত হয় নাই। চাকমাসহ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কিছু উচ্চাভিলাষী লোক বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী বৈরীতায় তৎপর। তাদের বিদ্রোহ দমাতে জরুরী হলো চতুর্থ সাহসী পদক্ষেপ, যদ্দরুণ স্থাপিত হয়েছে সেনা নিবাস, এবং তারই পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপ্তি হয়েছে ভূমিহীন বাঙ্গালীদের আবাসন। কিন্তু এই শেষ দুই পদক্ষেপের পক্ষে অনুকুল তথ্য উপাত্তের চর্চা প্রয়োজনীয় ছিল যার প্রতি সরকার ও জাতি উদাসীন। বিপরীত ভুল তথ্য উপাত্তকেই অবলম্বন করে বিদ্রোহী উপজাতিরা শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে এবং দেশে বিদেশে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী সমর্থিত হচ্ছে। শান্তি চুক্তি হলো এই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ফয়সালা, যার সুফল শূণ্য।

কোন চুক্তি ও সুযোগ সুবিধাতেও উপজাতীয়রা সন্তুষ্ট নয়। তারা এ পর্যন্ত ৪ বার সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে। শিশু বাংলাদেশকেও তারা রেহাই দেয় নি। তাদের এই অব্যাহত অবাধ্যতাকে আর অবহেলা করা যায় না। এরা বিহারীদের মত অবাধ্য দ্বিতীয় শরণার্থী বংশধর। গণহত্যা ও বিদ্রোহের কারণে এদের বৈরী ঘোষণা, নাগরিকত্ব বাতিল, বিচারে সোপর্দ ও ক্যাম্পে আটক করা আবশ্যক। একমাত্র তাতেই তারা নিজেদের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবে।

পার্বত্য চুক্তি ও তৎসৃষ্ট সুযোগ সুবিধা এই উপজাতীয় অপরাধীদের বাগে আনতে সক্ষম হয়নি। এখন আরো অধিক অপেক্ষা করা বৃথা।

সরকারের নমনীয় তোষামোদ মূলক পার্বত্য নীতির ভুল ও ব্যর্থতাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এই ভুরের মূল কথা হলো বিদ্রোহী উপজাতীয়রা আসলে স্থানীয় আদি বাসিন্দা নয়, তারা বহিরাঞ্চলীয় শরণার্থী বংশধর। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ১৯০০/১ এর ৫২ ধারাতে তাদের অভিবাসন চিহ্নিত। ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ তাদেরকে ভোটাধিকার দান করেনি। সেহেতু ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ এর ভারত ব্যাপ্ত সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। এই বিদ্রোহী উপজাতিদের স্থানীয় আদি নাগরিক হওয়ার দাবী ভুল। দুনিয়াবাসীদের এই তথ্য জানতে দেয়া হচ্ছে না, এবং আমরা নিজেরাও তৎ সম্পর্কে অজ্ঞ। একমাত্র অস্থানীয় হওয়ার তথ্যই বিদ্রোহীদের দমিয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

সরকার স্থানীয় ইতিহাস উদ্ধার ও প্রচারে মোটেও সক্রিয় নন। এই শূন্যতা পূরণে ব্যক্তি পর্যায়ে এই অধম কিছু ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছি। আমার লেখা প্রবন্ধ কলাম প্রতিবেদন বই পুস্তক সীমিত আকারে হলেও গত অর্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ এই ধারণা দিয়ে যাচ্ছে যে, উপজাতীয় উচ্চাভিলাষীদের প্রচারিত রাজনৈতিক ধ্রান ধারণা ও প্রচলিত তথ্য উপাত্ত বিভ্রান্তিকর। স্থানীয় প্রকৃত তথ্য তা থেকে ভিন্ন, যা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী স্বার্থের অনুকুল।

আমি স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য প্রচারে কোন রূপ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাইনি। অথচ এই ইতিহাসের প্রকৃত উপকার ভোগী আমি ব্যক্তি নই, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি। আমার জীবনের সমুদয় সঞ্চয় ও উপার্জন এবং কর্মক্ষম সারাটি জীবন একাজে ব্যয় করেছি। এই শ্রমের আর্থিক

মূল্য অবশ্যই বিরাট। আমার এই ত্যাগ ও দেশ প্রেম কর্তৃপক্ষীয় পর্যায়ে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। আমি নিজেও তাতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এক অপগন্ডে পরিণত। বিপরীতে বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ মোটা অংকের বেতন ভাতা দামী গাড়ী বাড়ী আর উঁচু পদমর্যাদা ভোগ করছেন। শান্তি তবু সদূর পরাহত।

অর্থকড়ি আর প্রকাশনার অভাবে পার্বত্য সংকট মূল্যায়ন মূলক আমার লেখাগুলো ব্যাপক প্রচারের সুযোগ পায় নি। সরকার এই মুফত মূল্যায়নটি নিজস্বার্থে কাজে লাগাতেও সক্রিয় নন।

সত্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এদেশের কোন উপনিবেশ বা সংযোজিত অঞ্চল নয়। এবং বাঙ্গালীরাও এই অঞ্চলসহ গোটা বাংলাদেশের মূল স্থায়ী বাসিন্দা। বিপরীতে এতদাঞ্চলে উপজাতীয়রা বৃটিশ আমলের বহিরাগত অভিবাসী। বহিরাগমনের দ্বারা উপজাতীয়রা এখন স্থানীয় ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেলেও, রাজনৈতিক মর্যাদায় তারা অস্থানীয় সংখ্যালঘু। দেশের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙ্গালীদের এতদাঞ্চলে বসবাসের অধিকার মৌলিক, এবং এটি বাংলাদেশের আদি ও অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। সংখ্যালঘু বহিরাগত অভিবাসী জনগোষ্ঠী ভুক্ত লোকদের এতদাঞ্চল থেকে বাঙ্গালী বিতাড়ন আন্দোলন আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগ দাবী, তথা স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রনমূলক রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, দেশ ও জাতি বিরোধী অপচেষ্টার শামিল। এদের দমিয়ে দেয়া জাতীয় কর্তব্য। এই রাষ্ট্রদ্রোহী ও জাতি বিধ্বংসী তৎপরতা মোটেও সহনীয় নয়। এটা মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার রূপেও মান্য নয়। বাংলাদেশে একক ভাবে বাঙ্গালীরাই মূলত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জাতি। এটা উদারতা যে স্থানীয় অবাঙ্গালী সংখ্যালঘুদের অন্ত র্ভুক্ত করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে কোন বহিরাগত অবাঙ্গালী লোকের জাতি ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম সহ্য করা হবে। এ দেশে সমানাধিকার নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পূর্ব শর্ত হলো তারা নিজেদের অভিবাসী সংখ্যালঘু মানবে, রাষ্ট্র ও বাঙ্গালী বিরোধী কোন অপতৎপরতায় জড়াবে না। কোন রূপ আধিপত্য, অগ্রাধিকার, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ও বাঙ্গালী বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিবে না। এর নিশ্চয়তা হিসেবে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা দিতে হবে যে সমুদয় উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন বিলুপ্ত হলো, অতীতের সমুদয় হানাহানি সহিংসতা আর বিভেদ অপরাধমূলক বিদ্রোহাত্মক কার্যক্রম। তজ্জন্য দেশ ও জাতির কাছে তারা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। সাধারণ উপজাতীয়রা দেশদ্রোহী, গণহত্যাকারী ও যুদ্ধপরাদের মত দুষ্কর্মের হোতাদের আইন সঙ্গত শাস্তি বিধানে সম্মত।

উপজাতীয় পাড়া প্রধান কারবারী, হেড ম্যান, রাজা, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও চেয়ারম্যান, পৌরসভা সদস্য ও চেয়রম্যান, উপজেলা ও জেলা পরিষদ সদস্য ও চেয়ারম্যান, স্কুল কলেজের কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষক ইত্যাদি গণ্যমান্যদের একত্রিত হয়ে উপরোক্ত ঘোষণ পত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর দিতে হবে। তৎপর কেবল দেশ ও জাতি দ্রোহী অপরাধী বিপদজ্জনক ব্যক্তিদের সংশোধনাগারে আবদ্ধ করা হবে। অভিযোগ থেকে সাধারণ নিরীহ লোকেরা রেহাই পাবে নির্বিচারে সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। বৈরী ঘোষিত চিহ্নিত অপরাধীরা বিচারে সোপর্দ হয়ে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশদ্রোহমূলক অপরাধ ক্ষমারযোগ্য নয়।

নির্বিচার উদারতা বাংলাদেশের পক্ষে ক্ষতিকর। অপরাধের বিচার ও শাস্তির উদাহরণ অবশ্যই স্থাপিত হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় স্বদেশ ভূমি নয়। ত্রিপুরাদের জাতীয় স্বদেশ ভূমি ত্রিপুরা রাজ্য, লুসাই বা মিজোদের জাতীয় স্বদেশ ভূমি মিজোরাম, মগ, মারমা, রাখাইন ইত্যাদির জাতীয় স্বদেশ ভূমি আরাকান ও মিয়ানমার, চাকমা তঞ্চগ্যা ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরও জাতীয় স্বদেশ ভূমি আরাকান সহ সীমান্তবর্তী বহিরাঞ্চল। এই অভিবাসী বিদেশী বংশধরদের এতদাঞ্চলে স্বশাসন, স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর কোন মৌলিক ভিত্তি নেই। স্বদেশ ভুমির একাংশ পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার দাবী করা, তদজন্য তাদের উপর আক্রমন অত্যাচার ও দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক প্রচেষ্টা চূড়ান্ত দুষ্কর্ম। উপজাতিদের এ কাজগুলো পুরস্কার যোগ্য নয়। অথচ তথাকতিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি এমনই এক পুরস্কার ব্যবস্থা। দেশ জাতি ও বহিরবিশ্বের তৎপ্রতি সমর্থন দান প্রহসন বিশেষ। তবে সৌভগ্যের কথা চুক্তিটি সরকার সমর্থিত হলেও তা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত নয়। এই চুক্তি গণহত্যা আর দেশদ্রোহকে ক্ষমাযোগ্য করেনি। দোষ স্বীকার ক্ষমা প্রার্থনা আর আনুগত্যের অঙ্গীকার ছাড়া উপরোক্ত অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ভুক্ত করা যায় না। অপরাধীদের উচ্চপদ, বেতন বাতা, দামী গাড়ী বাড়ী ইত্যাদির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা ও পালন পোষন কার্যতঃ অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা। এ পর্যন্ত তাতে কোন সুফল ফলেনি। পর্বতাঞ্চলেও শান্তি আসেনি। হালের ঘটনা হলো ক্রস ফায়ারে অসংখ্য দুস্কৃতিকারীর ভবলীলা সাঙ্গ হচ্ছে, জঙ্গীরা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলছে, আর দুর্নীতিবাজ হুমরা চুমরা রাঘব বোয়ালরা শাস্তি পাচ্ছে ও জেল খাটছে। এমতাবস্থায় উপজাতীয় দেশদ্রোহী দুস্কৃতিকারীরা জামাই আদর পাচ্ছে, এটা ভুল ও ব্যতিক্রমী ঘটনা ক্ষমতাসীনদের জন্য এটা এক দূর্ভাগ্যজনক উদাহরণ।

পার্বত্য জনসংহতি সমিতির নেতারা অবশ্যই যুদ্ধাপরাধী দেশদ্রোহী ও গণহত্যার হোতা। পাহাড়ী বাঙ্গালী হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ লোককে তারা হতাহত উচ্ছেদ ও নিঃসম্বল করেছে। বাংলাদেশের ৯৯% অধিবাসী বাঙ্গালীরা এদেশের স্থায়ী ও আদি অধিবাসী। পার্বত্য উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়, বহিরাগত। এই ইতিহাসের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির নেতারা বাঙ্গালীদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বহিস্কার দাবী করে, যা জঘন্য অপরাধ। গণহত্যা মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশদ্রোহ, আর বাঙ্গালী বিতাড়ন দাবী অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। এটা বিনা বিচার ও শাস্তিতে পার পেতে পারে না। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ধারা নম্বর ৫২ তাদেরকে বহিরাগত অভিবাসী রূপে চিহ্নিত করেছে। বৃটিশের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অনুমোদিত সাধারণ নির্বাচনে ভারতব্যাপী ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে প্রদেশ ও কেন্দ্রে সরকার গঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতিরা ছিল সে সময় ভোটাধিকার বঞ্চিত। ভোটাধিকার বঞ্চিত উপজাতীয়রা তখন তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেনি। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই ভাবা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা তখন স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দারূপে গণ্য ছিলো না। তাই তাদের ভোটাধিকার হীন রাখা ছিল যথার্থ। এই মূল্যায়নটিকে মৌলিক ও যথার্থ ভাবা যায়, যা এখনো প্রয়োগ ও প্রবর্তন যোগ্য। তবে পাকিস্তান আমলের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই মূল্যায়নটির

ব্যতিক্রম করে পার্বত্য উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দান করা হয়, যা যথার্থ ছিল না যা এখন প্রত্যাহার যোগ্য। এখন পাকিস্তান আমলের ভোটাধিকার দানকে অব্যাহত রেখে উপজাতীয়দের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা একটি ভুল। এখন এর সংশোধন করা আবশ্যক। এই ভুলেরই প্রতিফল হলো আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে জনসংহতি সমিতির বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীদের অধিকারকে অস্বীকার, পর্বতাঞ্চলে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

বিদ্রোহী উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দানের ভুলকে উদারতা ভাবা হলেও, তাতে কোন সুফল ফলেনি। এটি হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে আত্মহননের শামিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে চাকমা প্রধান ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন এবং ১৮৩০ জন উপজাতীয় রাজাকার ও সিভিল ফোর্সের সশস্ত্রভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা ও তৎপর সশস্ত্র বিদ্রোহ আর গণহত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরূপ অপরাধের জন্যই অভিবাসী বিহারীরা এখন বৈরী ঘোষিত ও শিবিরবাসী হয়ে দূর্ভাগ্যজনক বন্দি জীবন যাপন করছে। বিদ্রোহী উপজাতীয়রাও এরূপ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ভুল স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে দেশ ও জাতির অনুকম্পা লাভের সুযোগও তারা নেয়নি। সরকার অযাচিতেই যুদ্ধাপরাধী ত্রিদিব রায়ের অন্যতম পুত্র দেবাশীষ রায়কে উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করেছেন। এই উদারতা ও অনুকম্পার প্রতিদান রূপে তিনি বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। এই দুস্কর্মসমূহের প্রতিবিধানে আবশ্যক হলো সব অনুকম্পা ও উদারতা রদ করা, শান্তি চুক্তি রহিত করা, অগ্রাধিকারমূলক সব ব্যবস্থাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ রহিত করা, এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী উপজাতীয় ভোটাধিকারের অবসান।

উপজাতীয় দুস্কৃতিকারীদের অপরাধ বোধ না হওয়া এবং জাতি ও দেশের কাছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা, দূর্ভাগ্যজনক। সেদিন অবশ্যই আসন্ন, যেদিন উপজাতীয়রা নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য বৈরী ঘোষিত ও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং শাস্তি পাবে। জাতি ও দেশের পক্ষে সে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আতিকুর রহমান
ডিএসবি কলোনী, রাঙ্গামাটি
লেখক, গবেষক ও কলামিষ্ট।

রাঙ্গামাটিতে জলমগ্ন রাজবাড়ী

লুসাই সর্দার রত্তন পুঁইয়া ও
থাং লিয়ানার সঙ্গে ক্যাপ্টঃ
টমাস হার্বার্ট লুইন।
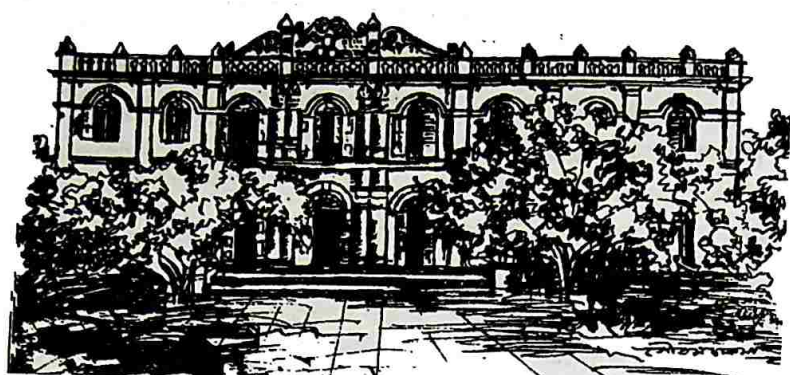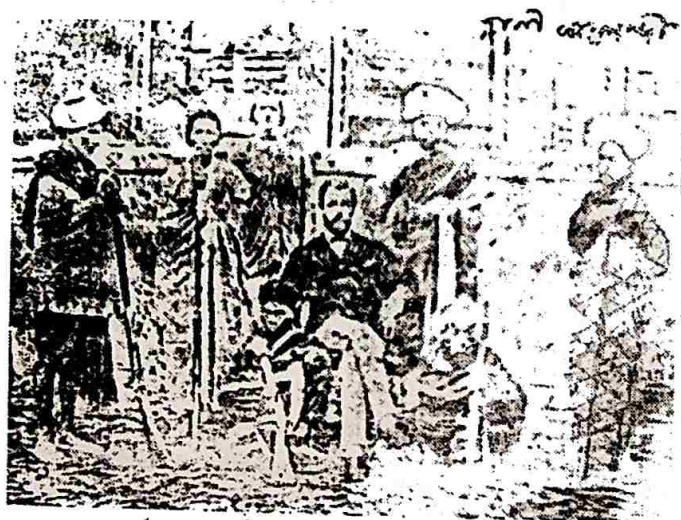
চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাস

অনেকদিন পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে 'শাক্য' নামে এক রাজা বাস করতেন। কল্পনগর নামক স্থানে তার রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেখানে তিনি ঈশ্বরের মূর্তি তৈরী করে তার আরাধনাতেই নিজেকে মগ্ন রাখতেন। সানকুশি নামীয় 'মন্ত্রীর' জন্মও এই পরিবারে। তিনি দুষ্টের দমন নীতিতে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন করতেন। 'সুধন্য' নামে শাক্য রাজার এক সাহসী পুত্র ছিলেন। তিনি ক্ষত্রীয় বীরদের মত শত্রুদের দমন করতেন। রাজা সুধন্য সেনাপতি জয়ধনকে সঙ্গে করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। রাজা সুধন্যের দুই রাণী ও তিন পুত্র ছিল। প্রথম রাণীর পুত্র 'গুনধন' রাজকীয় আনন্দ পরিত্যাগ করে মোহমুক্তির জন্য কঠোর তপস্বীর জীবন যাপন করতেন। কনিষ্ঠ রাণীর 'আনন্দমোহন' ও 'লাঙ্গলধন' নামে দুই পুত্র ছিলেন। আনন্দমোহন সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হলুদ বস্ত্র পরিধান করলেন।

দ্বিতীয় পুত্র 'লাঙ্গলধন' রাজা হয়ে প্রজাদের শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

লাঙ্গলধনের পুত্র 'সুদ্রজিৎ' কয়েক বছর রাজ্য শাসন করলেন। সেনাপতি জয়ধনের পুত্র 'সুবল' এবং সুবলের পুত্র 'শ্যামল' পর পর তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। সুদ্রজিতের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে 'সমুদ্রজিত' রাজা হলেন। মন্ত্রী শ্যামলের সাহায্যে তিনি কয়েক বছর রাজ্য শাসন করলেন।

২০ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়ে রঙ্গিন বস্ত্র পরে বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের ও অবসান ঘটলো। মন্ত্রী শ্যামল কল্পনগর পরিত্যাগ করে হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব ঢালে একটা নূতন সাম্রাজ্যের পত্তন করলেন। তার নূতন রাজধানী নানা রকমের ফুলের বাগান, পুকুর ও মন্দির দিয়ে সাজান হ'ল।

চম্পাকলি নামে তার এক পুত্র ছিলেন। ইরাবতী নদীর পূর্বপারে তিনি একটা নূতন নগর গড়ে তুললেন এবং পুত্রের নাম অনুসারে এর নাম রাখা হ'ল চম্পকনগর। তিনি ইরাবতী নদীর তীরে একটা মন্দির নির্মাণ করে ঈশ্বরের মূর্তি স্থাপন করলেন। চম্পাকলির পুত্র সাধনগিরি খুব ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে নিজেকে নিমগ্ন রাখতেন এবং সাধনার উচ্চতম স্তরে পৌঁছেছিলেন। তিনি পুরাপুরি যোগসাধনের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ব্রহ্মযোগের সাহায্যে স্বর্গীয় জ্ঞানের আগুনে তিনি অজ্ঞানতার আঁধার এই পাপপূর্ণ দেহ পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে মোহমুক্তি লাভ করেছিলেন।

তাঁর পুত্র চেঙ্গিয়াসুর রাজা হলেন এবং ইটের মন্দির তৈরী করে ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেশের লোক এবং রাজা একই গোত্রের তাই তারা রাজার প্রতিষ্ঠিত মূর্তি পূজা করতে লাগলো। চেঙ্গিয়াসুরের দুই পুত্র ছিলেন- ধর্মসুর ও চান্দাসুর। চেঙ্গিয়াসুর খুব ধার্মিক ছিলেন এবং অনেক ভাল কাজ করে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র সিংহাসন ছেড়ে রঙ্গিন বস্ত্র পরে ধার্মিক জীবন যাপন করতে লাগলেন- আর দ্বিতীয় পুত্র চান্দাসুর রাজা হয়ে দুষ্টের দমন নীতিতে রাজ্য

শাসন করতে লাগলেন। মহারাজ চান্দাসুরের তিন পুত্র ছিলেন সুমেসুর, দেবাসুর ও বিষসুর।
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুমেসুর রাজা হলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন ভিমঞ্জয়। ভিমঞ্জয় বড় বীর ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি শিকারে বের হয়ে একা একা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতেন। সিংহ, গণ্ডার, মহিষ ও বাইসন ধরা তার শিকার ছিল। একদিন কিছু সৈন্য নিয়ে শিকার করতে করতে হিমালয় পর্বতেরপূর্ব ঢালে অবস্থিত গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। হরিণ শিকারের আগ্রহে ঘুরতে ঘুরতে একটা উচুঁ পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। এর উপর একটি সোনার মন্দির দেখতে পেয়ে মহারাজ তাঁর সৈন্যদের বললেন, "চলো আমরা এই মন্দিরের দরজা খুলি এবং দেখি কার মূর্তি এর মধ্যে স্থাপন করা আছে।" দরজা খোলার পর দেখতে পেলেন সেখানে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন করা আছে। এর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের মত এবং মূর্তির সামনে একখণ্ড পাথরের উপর বুদ্ধের কিছু বাণী আছে। রাজা সেইসব ধর্মানুশাসন নকল করে নিলেন এবং এই মূল্যবান বাণী নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। "সম্বুদ্ধ" রাজা ভিমঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন।
রাজা সম্বুদ্ধের বিজয়গিরি ও উদয়গিরির নামে দুই পুত্র ছিলেন। বিজয়গিরি চম্পকনগর পরিত্যাগ করে নদীপথে ছয় দিন ও ছয় রাত্রি চলার পর কোন এক স্থানে এসে নামলেন। তার সঙ্গে চারজন পণ্ডিত ও ৭ "চাম্মুস" (প্রায় ২৬ হাজার) সৈন্য ছিল। বিজয়গিরি নিজের সাথে এক দল সৈন্য রেখে "তেওয়া" নদীর তীরে "কালাবাঘা" নামক স্থানে থেকে গেলেন। অবশিষ্ট সৈন্য সঙ্গে দিয়ে সেনাপতিকে সম্মুখ যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর আমরা বিজয়গিরি আর কোন সংবাদ জানি না। তাঁর সেনাপতি "ইনডাং" বা "ক্রিনডাং" পাহাড়ে ও "টেকনাফে" যুদ্ধ করেছিলেন। অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে সেনাপতি যুদ্ধে জয়ী হয়ে বিজয়গিরিকে সংবাদ দিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে বিজয়গিরি সেনাপতির সঙ্গে দেখা করে বিজিত রাজ্য শাসন করার ব্যবস্থা করলেন। এরপর সেনাপতি তার জন্মভূমিতে ফিরে গেলেন। পরবর্তীকালে বিজয়গিরিও দেশে ফিরছিলেন, কিন্তু কালাবাঘা অঞ্চলে পৌঁছেই শুনতে পান যে তার পিতা মারা গেছেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়গিরি অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করে বসেছেন। এই সংবাদ পেয়ে তিনি দেশে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার বিজিত রাজ্যে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি একজন "আরি" মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তবে রাজা বিজয়গিরির কোন বংশধর ছিল না। (তিনি নিঃসন্তান মারা যান।)
বার্মার ইতিহাস "চুইজাং কিয়াথা"- তে বর্ণিত আছে যে, বার্মা সাম্রাজ্য তিনটি দেশে বিভক্ত ছিল এবং তার একটি চাকমা রাজার অধীন ছিল।
যে-সব চাকমাকে সম্মুখ-যুদ্ধে পাঠান হয়েছিল শ্বেতহস্তি তাদের একজনকে মাথায় তুলে নিয়ে এলো এবং তাকেই রাজ-সিংহাসনে বসান হ'ল। তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁর মেয়ের নাম ছিল "মানিকবি"। তাঁর স্বামী বাঙ্গালীদের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি মগদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছেন এইজন্য তাঁকে বলা হত "বাঙ্গালী সর্দার"।

এইসব যুদ্ধ ১১১৮ ও ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোয়াং (আরাকান)-এ হয়েছিল। (আরাকানের ইতিহাস ডেঙ্গা ওয়াদি আরেদফুং-এর ১৭ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
মানিকবির পুত্র "মানিকগিরি" মানিক (মুক্তা) পেয়ে রাজা হলেন। তাঁর পুত্র "মাদালিয়া" তারপর রাজা হলেন। তারপর "মাদালিয়ার" পুত্র "রামাথংজা" রাজা হলেন। রামাথংজার পুত্র "কামালচেগা"। তাঁর রাজত্বের সময়ই বোয়াং- এ যুদ্ধ হয়েছিল এবং চাকমারা ঐ সময় সে দেশ থেকে দেশান্তরিত হয়ে যায়। কামালচেগার পুত্র রতনগিরি তারপর সিংহাসনে বসেন। তাঁর পুত্র "কালাথংজা" তারপর রাজা হন। তারপর তাঁর পুত্র "সেরমাট্যা" রাজা হন। তাঁর রাজত্বের সময় নামকরা সেনাপতি "রাধা মোহনের" নেতৃত্বে চাকমারা বোয়াং-এ যুদ্ধ করেন। ঐ সময় চাটিগাঁ ছাড়া (চট্টগ্রামের গান) কবিতা রচিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র "অরুণযুগ" রাজা হন। মগদের সঙ্গে তাঁর বহুবার যুদ্ধ হয়েছিল। অরুণযুগের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। আরাকানের ইতিহাস ডেঙ্গা ওয়াদি আরেদফুতুং এ বর্ণিত আছে যে, ১৩৩৩-১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বার্মার রাজা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বিজ্ঞোচিত মনে না করে বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছায় তাঁর উজিরকে চাকমারাজ অরুণযুগের নিকট পাঠান। দূত গিয়ে জানালেন যে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁকে পাঠান হয়েছে এবং বার্মার রাজা চাকমা রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য একজন মহিলা সঙ্গে পাঠিয়েছেন। অরুণযুগ যখন সেই মেয়েকে নিয়ে রাজধানী "মইসাগিরিতে" আনন্দ করছিলেন (মেয়েটিকে বর্মা রাজার বোন বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল), হঠাৎ রাত ১২টার সময় তিনি ঐ উজির কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বন্দী হন। তাঁর ছেলেমেয়েদেরকেও বন্দী করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ছেলেকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তৃতীয় ছেলেকে সামুদ্রিক বণিকদের নিকট থেকে আবগারী শুল্কের "আদায়কারী" নিযুক্ত করা হয়। সেইজন্য তাকে ঘাট্যা বা "ঘাওটিয়া রাজা" (খাজনা আদায়কারী রাজা) বলা হতো। মগ রাজা জ্যেষ্ঠ রাজকুমারী "সোনাবিকে" বিয়ে করলেন ও কনিষ্ঠাকে পারিষদদের একজনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। বসবাস করার জন্য দুই রাজকুমারীকে দুইটি দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের নাম অনুসারে দেশ দুইটির নাম হলো "সোনাপুর" ও "মানিকপুর"। ঘাট্যা রাজার নাম ছিল "চান্দুথংজা"। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র "মইসাং" রাজা হলেন। এই মইসাংই কর দিতে না পেরে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে যান। সেজন্যই তাঁকে মইসাং (বৌদ্ধ ভিক্ষু) রাজা বলা হতো। তাঁর সময়ই চাকমাদের উপর মগেরা খুব অত্যাচার করতো, এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা গোপনে ঠিক করে যে এই দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। এই রাজা সম্বন্ধে একটা কথা আছে যার অর্থ এইরূপ- "মইসাং রাজা আমাদের সঙ্গে আসলেও আমাদের কোন আনন্দের কারণ নেই এবং না আসলেও কোন দুঃখ নেই।" (এলে মৈসং লালস নেই, ন এলে মৈসং কেলেস নেই- চাকমা গান।)
মইসাং রাজার পুত্রের নাম ছিল "মারিকিয়া"। মারিকিয়ার রাজত্বকালেই চাকমারা রোয়াং ছেড়ে এসে কদমতলীতে বসবাস করতে থাকে। এই জন্যই "মারিকিয়ার" পুত্রকে এই স্থানের নাম অনুসারে কদমথংজা বলে ডাকা হতো।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র "রদংছা" রাজা হলেণ। তারপর তাঁর পুত্র "তিন সুরেশ্বরী" রাজা হলেন। "জানু" তিন সুরেশ্বরীর পুত্র ছিলেন। তাঁর সেনাপতি রণ-পাগলা (যুদ্ধ পাগল) মগদের সঙ্গে "তৈনছড়িতে" বহুবার যুদ্ধ করেছেন। জানু রাজার এক মেয়ের স্বামীর নাম ছিল "বুড়া বড়ুয়া (বৃদ্ধ বড়ুয়া)"। জানু ১২০ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। তাঁর প্রথম মেয়ে "সাজেম বি"র মগ রাজার সঙ্গে এবং দ্বিতীয় মেয়ে "রাজেম বি"র বুড়া বড়ুয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো।

বুড়া বড়ুয়ার ছেলে "সাথুয়া" রাজা হলেন। তিনি পাগলা রাজা বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন এবং যোগ সাধনা অবলম্বন করতেন। কথিত আছে যে, তিনি তার হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী-ভুঁড়ি বের করে ধুচ্ছিলেন তখন রাণী উকি মেরে দেখে ফেলেন, যার ফলে তিনি আর তাঁর হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীবুঁড়ি যথাস্থানে রাখতে পারলেন না। ফলে তিনি সত্যিকারের পাগল হয়ে গেলেন। তারপর রাণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি মানুষ মারতে শুরু করলেন। একটা প্রবাদ আছে যে কোন এক সময় পাগলা রাজা বাইরের ঘরে বসা অবস্থায়, পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে একটা লোক বন্য হাতী এসেছে বলে চিৎকার করতে থাকে, রাজা হাতিটি দেখার জন্য গলা বাড়ালে একজন লোক পিছন দিক থেকে এসে এক আঘাতে তাঁর মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তার দুই পুত্র "চানান খাঁ" ও "রতন খাঁ" কে ও হত্যা করা হয়।

পাগলা রাজার মৃত্যুর পর রাণী নিজ হাতে রাজ্যের শাসনভার গ্রহ করলেন। খুনী মেয়ে বলে তাঁর খুব বদনাম হলো। পাগলা রাজার অমঙ্গলী নামে এক কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিল "মুলিমাথংজা"। একটা বাঁশের সিংহাসন তৈরী করে নৈছড়া নদীর মুখে স্থাপন করা হ'ল। ধুর্য্যা, কুর্য্যা ধাবানা ও পীড়াভাঙ্গা এই চারজন মন্ত্রীর মধ্যে ধাবানা খুব ভোরে উঠে ঐ সিংহাসন দখল করে রাজা হলেন, আর একটা কারণ হলো যে, তিনি শেষ রাজার কন্যার পুত্র ছিলেন। অমঙ্গলীর আরও একজন পুত্র ছিলেন- তাঁর নাম ছিল পীড়াভাঙ্গা।

ধাবানার পুত্র "ধারা মিয়া" তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হলেন। তারপর ধারা মিয়ার পুত্র "মগল্যা" রাজা হলেন। "জুবাল খাঁ" ও "ফতেহ খাঁ" নামে তাঁর দুই পুত্র ছিলেন। মগদের সঙ্গে জুবাল খাঁর অনেক যুদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর সেনাপতি কালু খাঁ সর্দার মুসলমান নবাবদের সঙ্গে অনেক বড় বড় যুদ্ধ করেছেন। এইসব যুদ্ধে দুইটি বড় কামান দখল করা হয় এবং সেনাপতি ও রাজার ভাইয়ের নাম অনুসারে যথাক্রমে এগুলির নাম রাখা হয় কালু খাঁ ও ফতেহ খাঁ। জুবাল খাঁ অল্প বয়সে মারা যান ও রাজ্য শাসনের জন্য তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

জুবাল খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তাঁর ভাই ফতেহ খাঁ রাজা হন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফতেহ খাঁ নবাবদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফররুখ শাহ ও মোহাম্মদ শাহ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নিম্নভূমির বেপারীদের সঙ্গে ১১ মণ তুলার বিনিময়ে ঝুম-চাষীদের সঙ্গে ব্যবসা করতে দিয়েছিলেন।

ফতেহ খাঁর তিন পুত্র- শেরমস্ত খাঁ, রহমত খাঁ ও শেরজান খাঁ। জ্যেষ্ঠপুত্র শেরমস্ত খাঁ

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হলেন। তার সময়ই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা 'মিঃ হেনরী ভেরেলস্ট' নিজামপুর (ঢাকা) রাস্তা, কুকি রাজ্য, ফেনী ও সাঙ্গু দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমি চাকমা রাজার রাজ্য বলে ঘোষণা করেন (মিঃ হাসিনসন-এর গেজেটিয়ার থেকে)।

শেরমস্ত খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন তাই শুকদেবকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন শুকদেব রাজা হলেন তখন তিনি এক বিরাট ভূখণ্ড বসবাসের উপযোগী করেছিলেন যা এখন "তরফ শুকদেব" নামে পরিচিত। তিনিও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

রাজা ফতেহ্ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র রহমত খাঁর এক পুত্র ছিল্ তাঁর নাম "শের দৌলত খাঁ"। শুকদেবের মৃত্যুর পর শের দৌলত খাঁ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। শের দৌলত খাঁর রাজত্বে ইংরেজ ও চাকমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। মিঃ লেনও মিঃ তুরমারস দুইবার আক্রমণ করে অকৃতকার্য হয়েছিলেন (মিঃ কটনের রেভিনিউ হিস্ট্রি দ্রষ্টব্য)। জান বক্স খাঁ শের দৌলত খাঁর পুত্র। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে জান বক্স খাঁ রাজা হন।

১৭৮৩, ১৭৮৪ ও ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে জান বক্সের যুদ্ধ হয়। তাঁর সেনাপতি ও ভগ্নীপতি রনু খাঁ দেওয়ানকে ইছামতির মুখে, সেনাপতি জানু দেওয়ানকে ধুরুং-এ এবং নারান দেওয়ানকে হাজারীবাগে রাখা হয়েছিল। জান বক্স খাঁ নিজে "মহাফ্রুং" এর পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিলেন। সেই সময় একজন গর্ভবতী নারী পালিয়ে যাবার সময় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিল। রাজা হঠাৎ সেই কথা শুনে ফেলেন। তাতে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা গিয়ে বড়লাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ৫০০ মণ তুলা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে ঘোষাল পরিবারের নামকরা জমিদার সেই সময় রাজাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। জান বক্স খাঁর তিন পুত্র ছিলেন, তব্বার খাঁ, জব্বার খাঁ ও দুলা।

জান বক্স খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তব্বার খাঁ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি রাজনাগরে একটি "সাগর" (বিরাট দীঘি) খনন করেন। তব্বার খাঁ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জব্বার খাঁ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন।

তাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র "ধরম বক্স খাঁ" ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। রাজা চট্টগ্রামের ভট্টাচার্য্য পরিবারের (পুরোহিত শ্রেণী) নিকট থেকে হিন্দু মন্ত্র গ্রহণ করে "মহারাজ ভট্টাচার্য নাম গ্রহণ করেন। ধরম বক্স খাঁর তিন রাণী ছিলেন- "কালিন্দি" রাণী, "আতক" ও "হারি" রাণী। হারি রাণীর গর্ভে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম "মেনকা"। গোপীনাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মেনকার প্রথম পুত্র হরিশচন্দ্র।

মহারাজ ধরম বক্স খানের মৃত্যুর পর সরকার মুলিমা গোত্রের সুখলাল দেওয়ানকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় সন্তোষজনক কোন ফল না হওয়ায় কালিন্দি রাণী নিজের হাতে জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ের ভার তুলে নেন। ব্রিটিশ সরকারের বার বার চাপ দেওয়া সত্ত্বেও হরিশচন্দ্র সাবালক হয়েও কালিন্দি রাণীর নিকট থেকে জমিদারীর দায়িত্ব বুঝে নেন নাই। রাণীর প্রতি অগাধ

ভক্তিই এই দায়িত্ব না নেওয়ার কারণ। কালিন্দি রাণী যোগ্য ও সুশাসন দ্বারা জমিদারী সম্প্রসারিত করেছিলেন। তিনি মহামুণি মন্দির নির্মাণ, বাৎসরিক মহামুণির মেলার সূত্রপাত, মহামুণি দীঘি খনন এবং অন্যান্য ধর্মীয় কাজ করে অমর হয়ে আছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যেসব সিপাহী শাস্তির ভয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করেছিল তিনি তাদেরকে ধরে সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। ১৮৭১-১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে "লুসাই" অভিযানের সময় রাণী তার পৌত্র হরিশচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্র রাষ্ট্রের প্রতি খুব অনুগত ছিলেন ও খুব মূল্যবান সাহায্য করেছিলেন, যার ফলে তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং একটি সোনার ঘড়ি ও চেন দেওয়া হয়, যার মূল্য ১০০ পাউন্ড। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হরিশচন্দ্র "কালিন্দি" রাণীর মৃত্যুর পর রাজা হন। সরকার তাঁকে রাজানগর ছেড়ে রাঙামাটিতে প্রজাদের সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য করেন। রাজার দুই রাণীর দুই পুত্র ছিল- ভুবন মোহন বড় রাণীর, রমনী মোহন ছোট রাণীর পুত্র।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হরিশচন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর জমিদারি ও চাকমা ভূখণ্ড "কোর্ট-অব ওয়ার্ডস" নিয়ে নেয়, কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার ভূবন মোহন নাবালক ছিলেন। তখন "রায় বাহাদুর কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান" চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের চাকমাদের দৃঢ় হস্তে শাসন করে সুনাম অর্জন করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কুমার ভুবন মোহন রায় সাবালক হয়ে রাজা হন। বাংলার মহামান্য গভর্ণর স্যার উডবার্ন তাঁকে নিম্নোক্তরূপে অভিনন্দিত করেন ঃ

"আপনি চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা গোত্রের প্রধান হয়ে এমন এক পদবী লাভ করলেন যে পদবী অর্পণ করা এক মহা আনন্দের ব্যাপার। আপনার গোত্রের জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশী এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী স্থান অধিকার করে আছে। আপনার সার্কেলের ব্যবস্থাপনা বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এতে দক্ষতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয়। আপনি যুবক কিন্তু ভাল শিক্ষা লাভের সুযোগ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে, স্থানীয় অফিসারদের উপদেশ যা আপনাকে সরসময় দেওয়া হবে। ওদের সাহায্যে আপনার সার্কেলের সুব্যবস্থা করতে সক্ষম হবেন। এতে আপনার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবে ও লোকজনের সুবিধা হবে। সরকার আপনাকে ও পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য প্রধানদেরকে সবরকম সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব, যাতে উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি হয়। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনি পাহাড়ীদের যাযাবর অভ্যাস ত্যাগ এবং যেখানে জমি পাওয়ায় সেখানে আবাদ করান।

রাঙ্গামাটি রাজবাড়ি
চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল
১৮ই অক্টোবর ১৯১৯ খ্রীঃ

–ভুবন মোহন রায়
৪৫ তম চাকমা রাজা

চাকমা রাজাদের ব্যবহৃত সীলমোহর

এ পর্যন্ত পন্ডিতমহল, চাকমা রাজ পরিবারের সংগ্রহ থেকে দশটি রাজকীয় সীলমোহরের ছাপ চিত্রগ্রহণ করেছেন। আমার সংগ্রহে একটি বাদে নয়টি চিত্র আছে। না পাওয়া সীলমোহরটি জনৈক নূরুল্লাহ খান নামীয় ব্যক্তির। সীলমোহরগুলোর যথার্থ পাঠোদ্ধারের কিছু চেষ্টা এ যাবৎ হয়েছে, তবে তা বিভ্রান্তিমুক্ত নয়। দেখা যায়, এগুলোর আটটি, আরবী বর্ণ সম্বলিত। দু'টিতে বাংলা ভাষ্য আরবী বর্ণে লিখিত ও হিন্দুদের দেবীর কীর্তন অন্তর্ভুক্ত আছে। এখানে ক্রমান্বয়ে সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পরিচয় ব্যক্ত হলো।

১) প্রাচীনত্বের বিচারে প্রথম সীলমোহরটি জনৈকা "সোনাবি" নামীয় মহিলার। তাতে নামের শেষে "এগারশ দুই" অংকের উল্লেখ আছে। লেখ শৈলীর বিচারে তা অপটু হাতে প্রস্তুত। তাই তাতে অঙ্কিত বর্ণ চিত্রগুলো অপরিপক্ক। এটা আয়তনে ও আকারে চতুষ্কোণ। দ্রষ্টব্য ছাপ চিত্র :

২) দ্বিতীয় সীলমোহরটি জনৈক শের জব্বার খানের। একটি বৃত্তের ভিতর প্রথমে এক লাইনে "রোসান আরাকান" দ্বিতীয় লাইনে " আল্লাহু রাব্বি" বাক্য এবং শেষ লাইনে "শের জব্বার খান" লিখিত এবং নামের উপরে ১১১১ সংখ্যার উল্লেখ আছে। লেখশৈলীর বিচারে এটাও অপটু হাতে তৈরী, হিজিবিজি অপরিষ্কার। আয়তনে ও আকারে এটি ডিম্বাকার রেখায় আবদ্ধ। ছাপ চিত্রটি দ্রষ্টব্য :

৩) তৃতীয় সীলমোহরটি জনৈক নূরুল্লাহ খানের। ওটির ছাপ চিত্র আমার কাছে নেই। তাই তার আকৃতি ও লেখ শৈলীর ব্যাখ্যা দান আমার দ্বারা সম্ভব নয়। সীলমোহরটির কোন ছাপচিত্র কোথাও প্রদর্শিত না হওয়ায় তার পাঠোদ্ধার, বিশ্লেষণ

দান বা এখানে তা প্রদর্শন আমার দ্বারা সম্ভব হলো না। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটির গবেষণা পত্রিকা ১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ জুন ১৯৮২তে "চাকমা জাতির ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক" নামীয় প্রবন্ধে বাবু অশোক দেওয়ান সীলমোহরটির ভাষ্য এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ "নূরুল্লাহ খান পিসরে শের জব্বার খান জমিদার সন ১১২৭"।
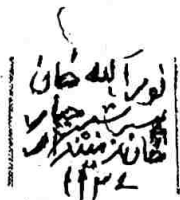
৪) চতুর্থ সীলমোহরটি, ফতেহ খাঁ নামীয় জনৈক ব্যক্তির। ডিম্বাকার ঐ সীলমোহরটির লেখাগুলো পরিষ্কার এবং তাতে ১১৩৩ সংখ্যাটি উল্লেখিত হয়েছে। এখানে তার ছাপ চিত্রটি -দ্রষ্টব্যঃ

৫) পঞ্চম সীলমোহরটি "জান বখশ খান মহারাজ" বর্ণনা সম্বলিত। লেখ শৈলীর বিচারে তা স্পষ্ট ও সর্বাধিক সুন্দর। ক্ষেত্র হিসেবেও তা হরতনের মত, যার উপরের অংশ ভিতরের দিকে চাপা। ১১৪৫ সংখ্যাটি তাতে স্পষ্টভাবে অংকিত আছে। ছাপ চিত্রটি-দ্রষ্টব্য।
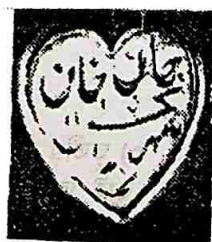
৬) ষষ্ঠ সীলমোহরটি জনৈক জব্বার খান নামীয় ব্যক্তির। তার উপরে নীচে অংকিত ক্রমিক বক্তব্য হলোঃ "শ্রী শ্রী জয় কালি জয় নারায়ণ তারা, জব্বার খান ১১৬৩।" ওটা গঠনে ডিম্বাকার। ছাপ চিত্রটি-দ্রষ্টব্য।

৭) সপ্তম সীলমোহরটি ধরম বখশ খান নামীয় ব্যক্তির, যার ভিতরকার বক্তব্য হলো : জয় কালি সহায় ধরম বখশ খান। তাও ডিম্বাকার তবে সংখ্যাহীন। চিত্রটি-দ্রষ্টব্য ঃ
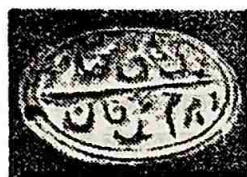
৮) অষ্টম সীলমোহরটির লেখ শৈলী সুন্দর, আকৃতি ডিম্বাকার ও তাতে ১১১৫ সংখ্যার উল্লেখ আছে। তৃতীয় কনিষ্ঠ এই সীলমোহরটি শুকদেব রায় বাহাদুরের। সীল চিত্রটি দ্রষ্টব্য ঃ

৯) নবম সীলমোহরটি রেখাচিত্র সমৃদ্ধ। তাতে বর্ণে ও সংখ্যায় লিখিত কোন ভাষ্য নেই। জোড়া গোল রেখার বেষ্টনীতে আবদ্ধ, চিত্রলিপি আখ্যা যোগ্য, ঐ রেখাচিত্রটিকে কেউ কেউ সিংহ চিত্র বলে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন,যা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন রাজকীয় প্রতীক বলে কথিত হয়। চিত্রটি দ্রষ্টব্য ঃ

১০) দশম সীল মোহরটি জনৈক শের দৌলত খাঁর যেটি আরবী বর্ণে লেখা তাতে সংখ্যা আছে ১১৩৫।

এখন এই পরিচয়ের ভিত্তিতে বর্ণিত সীলমোহরগুলোর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন এবং সেগুলোতে উল্লিখিত সংখ্যাগুলোর রহস্যোদঘাটন আবশ্যক। সীলমোহর-গুলোর দ্বারা নিম্নোক্ত তথ্যাদি লাভ করা সম্ভব, যথা :

ক) চাকমা সম্প্রদায় ও তাদের প্রধানদের মূল বাসস্থান ও বাংলাদেশে আগমনের কাল।

খ) সীলমোহরে উল্লেখিত সংখ্যাগুলোর পঞ্জিকা ও সংশ্লিষ্ট রাজাদের কার্যকাল।

গ) চাকমা রাজাদের মুসলিম নাম খেতাব ও আরবী বর্ণ ব্যবহারের রহস্য।

মোট নয়টি সীলমোহরের সাতটিতে, যে সংখ্যাগুলোর উল্লেখ আছে, মঘী সন হওয়ার ভিত্তিতে, ক্রমানুসারে সেগুলোর ধারক ব্যক্তিগণের সবাই নিজ নিজ পরিচয় ও ব্যক্তি চরিত্রকে স্ব-স্ব সীলমোহরে বক্তব্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তাদের কার্যকাল আর মর্যাদাও তাতে বিবৃত হয়েছে। দেখা যায়, সোনা বি নামীয় জনৈকা মহিলার সীলমোহরটি সর্বাধিক পুরাতন। সীলমোহরগুলো ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রতীক। এ হিসাবে সোনা বির পূর্ববর্তী কথিত চাকমা প্রধানদের স্বীকৃতি, প্রামাণ্য বা আনুষ্ঠানিক নয়। তবে এর দ্বারা পূর্ব বংশ ধারা অস্বীকৃত হয় না। রাজ পরিবারসূত্রে দাবিকৃত দীর্ঘ বংশ ধারার বিপরীতে সীলমোহরগুলোর দ্বারা রাজাদের প্রকৃত সংখ্যা সীমিত হয়ে যাচ্ছে। প্রাপ্ত সীলমোহরগুলোর দ্বারা রাজ তালিকাকে চূড়ান্ত ভাবাও যায় না। আরো অনাবিষ্কৃত নিদর্শন উদ্ধারের দ্বারা ভবিষ্যতে সে তালিকাটি আরো দীর্ঘ হতেও পারে। বাংলাদেশ বহির্ভূত অঞ্চলে তাদের পরিত্যক্ত বসবাস নিয়ে প্রামাণ্য তথ্য উদঘাটিত হলে, এই ইতিহাসে আরো সংযোজন ঘটাও সম্ভব। এখানে সীলমোহরগুলোর দ্বারা

প্রমাণিত রাজমর্যাদা ও ক্ষমতার পরিধির ভিতরই, আপাততঃ ঐতিহাসিক আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। অবশিষ্ট কথা কাহিনীগুলোকে কিংবদন্তিভুক্ত রাখা ছাড়া উপায় নেই। সীলমোহরগুলোতে আরবী বর্ণ,মুসলিম নাম ও খেতাবের ব্যবহার, ইসলামী ও হিন্দুধর্মীয় বাক্য প্রয়োগ এবং তার ধারকদের বসবাসক্ষেত্রের বর্ণনা, এ বিষয়গুলোই, এখানে প্রধান আলোচ্য। সীলমোহরীয় সংখ্যাগুলোর রহস্য উদঘাটিত হলে সেসবের প্রয়োগকাল সম্বন্ধীয় ধাঁধাটিও কেটে যাবে। তাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে চাকমা ইতিহাস রহস্যাবৃত্ত কিছু নয়।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই বর্ণিত সংখ্যাগুলোর রহস্য উদঘাটন দরকার। সংখ্যাগুলোর সম্ভাব্য পঞ্জিকা নির্ণয়ের সুবিধার্থে এখানে কিছু আলোচনা অপরিহার্য।

অতীতে চট্টগ্রাম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে আরাকানী শাসন ও মঘী সনের প্রচলন থাকার কথা প্রাচীন পুঁথি পুস্তক ও দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণিত। সে হিসাবে চাকমা রাজকীয় সীলমোহরগুলোতে মঘী সন ব্যবহৃত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে মুসলিম শাহী ও নবাবী দপ্তরে হিজরী সনের প্রচলন ছিলো। হিন্দু সমাজ বাংলা সনের প্রতি হামেশাই ছিলো অধিক অনুরক্ত। তবে আরাকানী দখল ও শাসন হেতু এতদাঞ্চলে মঘীর কদর ছিলো বেশী, যার প্রত্যক্ষ চর্চাক্ষেত্র হলো ব্রহ্মদেশ। হিন্দুস্তানে ১৫৫৬ খ্রীঃ সালের ১১ই এপ্রিল বাদশাহ্ আকবরের সিংহাসনে আরোহনের দিনকে ভিত্তি ধরে হিজরী চান্দ্র সনকে সৌর সনে পরিবর্তিত করে ফসলী সন নামে এক নতুন পঞ্জিকার প্রবর্তন করা হয়, যা পরিশেষে বাংলা অঞ্চলে বাংলা সন নামে অভিহিত হয়। সৌর বছরের মোটামুটি ১১.৮৬ দিন আগে চান্দ্র বছর শেষ হয়ে যায়, তাই চান্দ্র বছর সৌর বছরের মত ৩৬৫.২৫ দিনে হয় না। খ্রীঃ সনের চেয়ে শকাব্দ ৭৮ বছর, বাংলা ৫৯৩ বছর ও মঘী ৬৩৮ বছরের ছোট। এই হিসাবের ভিত্তিতে সন্দেহ মোচনার্থে সীলমোহরগুলোতে ব্যক্ত সংখ্যাগুলোর পৃথক পঞ্জিকাভিত্তিক কাল উদ্ভাবন করা যেতে পারে। তাতে ঐ সংখ্যাগুলোর পঞ্জিকা বিভ্রান্তির জবাব পাওয়া সম্ভব হবে। এখানে একটি ছক দ্রষ্টব্য, যেটিতে সীলমোহরীয় সংখ্যাগুলোকে, প্রচলিত কয়েকটি পঞ্জিকার হিসাবে তার সম্ভাব্যকালে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যাতে তুলনামূলকভাবে বর্ণিত সংখ্যাগুলোর সঠিক সময়কাল নির্ণয় সহজ হয়।

১-সোনা বি ১১০২ (**তুলনীয় পঞ্জিকা ঃ মঘী, বাংলা, শকাব্দ, হিজরী**)

ক) মঘী ১১০২ বাংলা ১১৪৭ শকাব্দ ১৬৬২ হিজরী ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪০

খ) বাংলা ১১০২ মঘী ৯৫৭ শকাব্দ ১৬১৭ হিজরী ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দ ১৬১৫

গ) শকাব্দ ১১০২ মঘী ৫৪২ বাংলা ৫৮৭ হিজরী ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ ১১৮০

ঘ) হিজরী ১১০২ মঘী ১০৫৩ বাংলা ১০৯৮ শকাব্দ ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ ১৬৯১

২. **শের জব্বার খান ১১১১/**

ক) মঘী ১১১১= বাংলা ১১৫৬ শকাব্দ ১৬৭১ হিজরী ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪৯

খ) বাংলা ১১১১= মঘী ১০৬৬ শকাব্দ ১৬২৬ হিজরী ১১১৬ খ্রীষ্টাব্দ ১৭০৪

গ) শকাব্দ ১১১১=মঘী ৫২১,বাংলা ৫৯৬ হিজরী ৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ১১৮৯

ঘ).হিজরী ১১১১ মঘী ১০৬২ বাংলা ১১০৭ শকাব্দ ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ ১৬৯৯

৩. নুরুল্লাহ খান ১১২৭/

ক) মঘী ১১২৭= বাংলা ১১৭২ হিজরী ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬৫

খ) বাংলা ১১২৭=মঘী ১০৮২ হিজরী ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২০

গ) হিজরী ১১২৭ = মঘী ১০৭৭ বাংলা ১১২২ খ্রীষ্টাব্দ ১৭১৫

ঘ) শকাব্দ ১১২৭= মঘী ৫৬৭ বাংলা ৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ ১৭০২

৪. ফতেহ খান ১১৩৩/

ক) মঘী ১১৩৩ - বাংলা ১১৭৮ শকাব্দ ১৬৯৩ হিজরী ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭১

খ) বাংলা ১১৩৩ মঘী ১০৮৮ শকাব্দ ১৬৪৮ হিজরী ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২৬

গ) শকাব্দ ১১৩৩ মঘী ৫৬৩ বাংলা ৬১৮ হিজরী ৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ ১২১১

ঘ) হিজরী ১১৩৩ মঘী ১০৮৩ বাংলা ১১২৮ শকাব্দ ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২১

৫. জান বখশ খান ১১৪৫/

ক) মঘী ১১৪৫ - বাংলা ১১৯০ শকাব্দ ১৭০৫ হিজরী ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৮৩

খ) বাংলা ১১৪৫ - মঘী ১১০০ শকাব্দ ১৬৬০ হিজরী ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩৮

গ) শকাব্দ ১১৪৫ - মঘী ৫৮৫ বাংলা ৬৩০ হিজরী ৬২০ খ্রীষ্টাব্দ ১২২৩

ঘ) হিজরী ১১৪৫ - মঘী ১০৯৪ বাংলা ১১৩৯ শকাব্দ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩২

৬. জব্বার খান ১১৬৩/

ক) মঘী ১১৬৩ বাংলা ১২০৮ শকাব্দ ১৭২৩ হিজরী ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দ ১৮০১

খ) বাংলা ১১৬৩ মঘী ১১১৮ শকাব্দ ১৬৭৮ হিজরী ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৬

গ) শকাব্দ ১১৬৩ মঘী ৬০৩ বাংলা ৬৪৮ হিজরী ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ ১২৪১

ঘ) হিজরী ১১৬৩ মঘী ১১১২ বাংলা ১১৫৭ শকাব্দ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২০

৭. ধরম বখশ খান : কোন সংখ্যার উল্লেখ নেই

৮. শুকদেব রায় ১১১৫

ক) মঘী ১১১৫ বাংলা ১১৬০ শকাব্দ ১৬৭৫ হিজরী ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৩

খ) বাংলা ১১১৫ মঘী ১০৭০ শকাব্দ ১৬৩০ হিজরী ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দ ১৭০৩

গ) শকাব্দ ১১১৫ মঘী ৫৫৫ বাংলা ৬০৫ হিজরী ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দ ১১৯৩

ঘ) হিজরী ১১১৫ মঘী ১০৫৭ বাংলা ১০০৭ শকাব্দ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ ১৬৯০

৯. শের দৌলৎ খাঁন ১১৩৫

মঘী ১১৩৫ = বাংলা ১১৮০ শকাব্দ ১৬৯৫ হিজরী ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭৩

বাংলা ১১৩৫ = মঘী ১০৯০ শকাব্দ ১৬৫০ হিজরী ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২৮

শকাব্দ ১১৩৫ = মঘী ৫৭৫ বাংলা ৬২০ হিজরী ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ ১২১৩

হিজরী ১১৩৫ = মঘী ১০৮৪ বাংলা ১১২৯ শকাব্দ ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২২

ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের গবেষণামূলক নিবন্ধে, কয়েকজন চাকমা রাজার সময়কাল সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, বর্ণিত সীলমোহরীয় সংখ্যাগুলো মঘী হিসাবে তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে হিসাবে হুবহু নয়, যথা :

১। শের মস্ত খান ১৭৩৭-খ্রীঃ মোতাবেক ১০৯৯-১১২০ মঘী

২। শের জব্বার খান ১৭৫৮-৬৫ খ্রীঃ মোতাবেক ১১২০-২৭ মঘী

৩। শের দৌলত খান ১৭৬৫-৮২ খ্রীঃ মোতাবেক ১১২৭-৪৪ মঘী

(সূত্র : রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ..... ড. এ এম সিরাজুদ্দিন, জার্নাল অফ দি পাকিস্তান হিষ্টোরিকেল সোসাইটি করাচী, খন্ড : ১৯ ঃ ভাগ ১, জানুয়ারী ১৯৭১)।

আমার মতে, বাবু অশোক দেওয়ান কর্তৃক বর্ণিত নূরুল্লাহ খানের সীলমোহরীয় সংখ্যাটির পাঠ সঠিক নয়। শুকদেব রায় বাহাদুর নামের সীলমোহরটির সংখ্যাতেও পঠনজাত ভুল আছে। তাতে বর্ণিত সংখ্যাটি ১২১৫ নয় ১১১৫ হওয়াই সম্ভব। এটা ধাঁধাঁর ব্যাপার যে, আদি রাজা শের মস্ত খাঁ বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রথম অধিবাস গ্রহণকারী হলেও তাঁর বন্দোবস্তি বা ক্ষমতার স্মারক কোন দলিল বা প্রত্নবস্তু নেই। তার কথিত পুত্র বা পোষ্য পুত্র শুকদেবের স্মারক সীলমোহর, শুক বিলাস নামীয় একটি জায়গা, আর শ্রুতি কথা ছাড়া সে যুগের প্রামাণ্য অন্য কিছুই প্রাপ্তব্য নয়। পরবর্তীকালের রাণী কালিন্দির দেওয়াল লিপিতে আর চাকমা জনসাধারণ কর্তৃক চর্চিত লোকগীতিতে শের মস্ত খাঁর আদি রাজারূপে উল্লেখ থাকায় অতীত কথাকাহিনীতে তার স্থান হয়েছে। অথচ তার সময় কালকে সীলমোহরের দ্বারা দখল করে আছেন অপর দুই চাকমা প্রধান যথা সোনা বি ও শের জব্বার খাঁন। অবশ্য প্রচলিত চাকমা ইতিহাসে এদের ও স্বীকৃতি নেই। রাজা নয়, জমিদার রূপেই শুকদেব স্বীকৃত, যা লোকগীতিতে ব্যক্ত হয়েছে।

নূরুল্লাহ খানের নামে প্রাপ্ত সীলমোহরটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। সুতরাং তার পাঠের পুরাপুরি শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তবে এই পাঠের কিছু অংশ শুদ্ধ ধরে সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। বাবু অশোক দেওয়ানকৃত সনটি ১১১৭ মঘী হলে, তা ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ সালে পরিণত হয়। তখন রাজা শের মস্ত খাঁ অথবা শের জব্বার খাঁর সময়কাল। তদুপরি নূরুল্লাহ খাঁ শের মস্ত খাঁর প্রত্যক্ষ বংশধর বা উত্তরাধিকারী নন। কার্যত: দেখা যায়, তাঁর পিতা শের জব্বার খানই ভ্রাতৃ সম্পর্কের

বলে; নিঃসন্তান শের মস্ত খাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়েছেন। পিতাকে ডিঙ্গিয়ে, শের মস্ত খানের উত্তরাধিকারী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। অথচ মূল্যবান প্রত্ন নিদর্শন সীলমোহরটি তাঁর ক্ষমতার সমর্থক। তাতে লেখা "নূরুল্লাহ খান পিসরে শের জব্বার খান জমিদার" বাক্যটি সঠিক হলে, তাঁর সঠিক সময়কাল বিতর্কিত ১১১৭ মঘী সন বলে নিরূপিত হতে পারে না। সংখ্যাটির শেষাংশ ১৭ না হয়ে ২৭ হওয়াই সম্ভব। আরবী এক অংকের মাথায় সামান্য একটু বাঁক লাগালেই তা দুই হয়ে যায়। অপটু রেখা আর অপরিষ্কার ছাপচিত্রের কারণেও বটে; আরবী পাঁচ, সাত, এক ও দুই সংখ্যায় গঠনগত ভিন্নতা ঘটা ও রূপ পরিচয়ে তফাৎ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। সুতরাং ১১১৭ এর মূল সংখ্যা ১১২৭ ই হবে। সে সময়টিকে নূরুল্লাহ খানের ক্ষমতা লাভের সম্ভাব্য সময় জ্ঞান করা যায়। পিতা শের জব্বার খানের মৃত্যুর পর তাঁর পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ করাও স্বাভাবিক। তৎপর স্বাভাবিক মৃত্যু বা আপোষে পদত্যাগের পর ক্রমান্বয়ে সহোদর ভাই ফতেহ খান ও শের দৌলত খান, পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকবেন।

এখানে রাজা ফতেহ খানের বিষয়টি একটি জটিল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই বিতর্কের অবসানের সূত্র তাঁর সীলমোহরেই ব্যক্ত আছে, আর তা মঘী সনের সংখ্যার সঠিক পাঠের মাঝেই নিহিত। সঠিক পাঠ নির্ণয়ের অভাবে, এই বিতর্কটি জটিল রূপ ধারণ করেছে। সনটি মঘী, কিন্তু লেখা আরবী বর্ণে উৎকীর্ণ, এতদোভয়ই চাকমা ইতিহাসের আলোচক পণ্ডিত মহলে প্রায় অপরিচিত। আলোচকদের এই অক্ষমতাকে বিবেচনা করে, কেউ ঐ ফতেহ খাঁকে জালাল খাঁয়, কেউ তাঁকে শের মস্ত খাঁর পিতায় পরিণত করেছেন। সনটিকেও স্থিরভাবে কোন একটি পঞ্জিকায় ধরে রাখা হয়নি।

আমার বিচারে বৃটিশ আমলসহ সবকটি সীলমোহরেই মঘী সন ব্যবহৃত হওয়ায়, ফতেহ খাঁর সীলমোহরের সনটি তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। লেখার মাধ্যম আরবী বর্ণ, সমানভাবে অনুসৃত হওয়ায় এবং নাম ও খেতাবে সমানভাবে ইসলামী ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন থাকায়, সনটি অব্যতিক্রমীভাবে মঘী। এই হিসাবে তাঁর সময়কাল স্থির হয় ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে। একটি প্রত্যক্ষ প্রত্ন নিদর্শনকে অস্বীকার করার মত অধিক শক্তিশালী যুক্তির উপস্থিতি ছাড়া তাকেই সত্য বলে ধরে নিতে হবে। তিনি শের দৌলত খাঁর আগে রাজ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

সীলমোহরগুলো সঠিক তথ্যজ্ঞাপনকারী পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ক্ষমতার প্রতীক। এগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষমতার কাল নির্ণয় করে। তাতে ব্যবহৃত বর্ণ সংখ্যা ও ধর্মীয় বাক্যগুলো তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতাকে স্পষ্ট করে। মোগল আমলের শেষ থেকে বৃটিশ আমলের প্রথমাংশ জুড়ে প্রায় শতাব্দীকাল সময় এই সীলমোহরগুলোর ব্যবহার কাল নির্ণিত হয়। তাতে ব্যবহৃত সংখ্যা ও বর্ণগুলো আরবী তবে পঞ্জিকাটি মঘী। প্রাপ্ত নামগুলোর মাঝে শুকদেব রায় বাহাদুর বাদে অবশিষ্ট সাতটি খাঁটি মুসলিম, চরিত্র সম্পন্ন। এই নাম ও পদবিগুলো আরবী ফার্সি ও তুর্কি ভাষাজাত। কোন একটি নাম পদবিও ভিন্ন নয়। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা বর্ণ ও নামকরণ পদ্ধতি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সীলমোহরগুলোতে তা ব্যবহৃত হয়নি। স্থানীয় বাংলা ও ঔপনিবেশিক ইংলিশ

ভাষাটিও অবহেলিত হয়েছে। সীলমোহরে ধর্মীয় আনুগত্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা ছিলো না। তবু তা ঘটায় মনে করা যায়,সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধর্মানুরাগ ক্ষমতার মতো উল্লেখযোগ্য ছিলো। তারা ধর্মীয় ব্যাপারে আবেগতাড়িত ছিলেন। চাকমাদের বর্তমানে আচরিত বৌদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস, একটি সীলমোহরেও স্থান পায়নি। শের জব্বার খাঁর সীলমোহরে উল্লেখিত বর্ণ, বাক্য, নাম ও পদবি, তাদের পারিবারিকভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার প্রতীক। এই ধর্মীয় ঐতিহ্য পরবর্তী জব্বার খাঁ ও তার ছেলে ধরম বখশ খাঁয় এসে, কালি ভক্তির আকারে আংশিকভাবে হিন্দু ধর্মীয় অনুরাগের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে। এটা ধর্মান্তর বা ধর্ম বিকৃতিও হতে পারে। তবে তাদের লেবাসী মুসলিম চরিত্র অক্ষুণ্নই ছিলো। এই মুসলিম চরিত্রের পাশাপাশি তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যহলো : তারা মূলত : আরাকানের রোসাংবাসী ছিলেন। শের জব্বার খাঁর সীলমোহরটি এটা লিখিতভাবে ব্যক্ত করে। সংখ্যাতত্ত্বীয় ব্যাপারটিও সন্দেহ মুক্ত। অধিকাংশ রাজা বৃটিশ আমলবাসী হওয়ায় সরকারী রেকর্ডপত্রে তাদের অনেকের কার্যকাল নির্ণীত আছে, যার ভিত্তিতে সীলমোহরীয় সংখ্যাগুলো মঘী পঞ্জিকাভুক্ত সন বলে নিশ্চিত হয়।

আঁরাকান রাজের চিঠি

``From the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong. Our territories are composed of five hundred and sixty countries and we heve ever been on terms of friendship The inhabitants of other countries willingly and freely trade with the countries belonging to us. A person named keoty habing absconded from our country, took refuge in yours. I did not however pursue him with a force but sent a letter of friendship on the subject desiring that keoty might be given up to me. You considering your own power and the extent of your possession refused to sent him to me. i also am possessed of extensibe country and keoty in consequnce of his disobedient conduct and the strength and influence of my king's good fortune was destroyed.

Dumcan Chukma and Kiecopa lies Marring and other inhabirants of Arracan have now absconded and taken refuge near the mountains within your border and exercise depredations on the people belonging to both countries and they moreover murdered an Englishman at the mouth of the Naf, and stole away everything he has with him. Hearing of this I am come to your boundaries with an army in order to sieze them. because they have deserted their own country and disobedient to my King, exercise the profession of robber. It is not proper that you should give asylum to them or the other Moghs who have absconded from Arracan and you will do right to drive them from your country that our friendship may remain perfect and the road of travellers and merchants may be secured. If you do not drive them from your comtry and give them up. I shall be under the necessity of seeking them out with an army, in whatever part of your territories they may be. I send this letter by Mahammed Wassene. Upon recipt of it, either drive the Moghs from your country, or if you mean to give them an asylum, return me an answer immediately. (Page : 29)

(Ref : THE HILL TRACTS OF CHITTAGONG AND THE DWELLERS THEREIN Capt. T.H. Lewine:

বাংলা ঃ আরাকানের রাজা থেকে চট্টগ্রামের প্রধানের উদ্দেশ্যে ঃ

আমাদের রাষ্ট্রীয় এলাকা পাঁচশত ষাটটি দেশ নিয়ে গঠিত, এবং আমরা চিরকালই পরস্পরের সাতে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের অধীন দেশ সমূহের অধিবাসীগণের সাথে স্বেচ্ছায় আর অবাধে অন্য বিভিন্ন দেশবাসী ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে। কেওটি নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনাদের আশ্রয় লাভ করেছে। আমি তাকে সসৈন্যে পশ্চাদ্ধাবন করছি না, তবে বিষয়টি নিয়ে একখানা বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছি, এই আশায় যে, কেওটিকে ধরে অবশ্যই আমার হাতে তুলে দিবেন। আপনারা নিজেদের শক্তি আর অধিকারের বিবেচনায় তাকে আমার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছেন। আমিও একটি বিশাল রাজ্যের অধিকারী। কেওটি পরিণামে তার অবাধ্য আচরণ আর আমাদের রাজার সৌভাগ্যের শক্তি ও প্রভাব গুণে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডোমকান, চাকমা, কায়কোপা, লাইচ, মেরিং ও অন্যান্য কিছু আরাকানী অধিবাসী, পালিয়ে গিয়ে আপনাদের সীমান্তভুক্ত পাহাড়াঞ্চলের আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছে এবং উভয় দেশের লোকজনের উপর উৎপীড়ণ চালাচ্ছে। অধিকন্তু তারা নাফ নদীর মোহনায় একজন ইংরেজকে হত্যা করে তার যথা সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। এটা শুনে আমি একদল সৈন্যসহ তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে আপনাদের সীমান্ত এলাকায় এসেছি। যেহেতু তারা নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করেছে। আমার রাজার প্রতি অবধ্য এবং দস্যু বৃত্তিতে লিপ্ত। সুতরাং তাদেরকে এবং ঐসব মগদেরকেও, যারা আরাকান থেকে পালিয়ে গেছে, আশ্রয় দান করা আপনাদের পক্ষে সমীচীন নয়। আপনারা তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সঠিক কাজই হবে। তাতে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে, এবং পথিক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত পথ নিরাপদ হবে। যদি তাদেরকে আপনাদের দেশ থেকে না তাড়ান ও ধরে হস্তান্তর না করেন, তাহলে আমি প্রয়োজনে আপনাদের দেশের যেখানেই তারা থাকুক না কেন, একদল সৈন্য নিয়ে ধরে আনতে বাধ্য হবো। আমি এই চিঠিখানা মোহাম্মদ ওয়াসেনকে দিয়ে পাঠালাম। এটি বুঝে পেয়ে, হয় মগ লোকজনকে আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন, নয়তো তাদেরকে আশ্রয় দেবার মতলব থাকলেও আমাকে যথাশীঘ্র প্রত্যুত্তরে জানাবেন। (সূত্র ঃ ঐঃ পৃঃ ২৯)

মিঃ লুইন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এভাবে বর্ণনা করেন যথা ঃ

These letters were received during the administration of Lord Cornwallis. They were followed up almost immediately by the entrance into our territory of a force of armed Burmese under the Sirdar of Arracan. The Chief of Chittagong in the same month of June, writes to the Governor General in Councl reporting this incursion and stating that he has declined to

respond to the overtures of alliance until this armed force was withdrawn. At the same time he states that in his opinion the refugies should be driven out of British territory. He adds that these fugitives were persons of some consequence in Arracan, and reports further that a Chakma Sirdar, who had flied from Arracan, had been arrested and confined by him. He concludes by stating his opinion that this Sirdar and his tribe have no intention of cultivating the low lands in a peaceable manner but have taken up their abode in the hills and jungles for the convenience of plundering. Ten years before this in the year 1777. it appears from a letter dated 31 st May. from the Chief of Chittagong to the Honourable Waren. Hasting. Governor General that some thousands of hill men had come form Arracn into the Chittagong limits, having been offered encouragement

to settle by one Mr. Bateman, who was the chief governing officer there at that time. These migrations were evidently for a long time a rankling sore to the Burmese authorities and (Macfarlane's History of British India. Page 355,) recods that in 1795 a Burmee army of 5,000 men again pursued some rebellious Chiefs or as they called them robbes, right into the English District of Chittagong. These Chiefs who had taken refuge in our territories were eventually given up to the Burmese and tow out the three were put to death with atrocius tortures.

In 1809 Macfarlane recods that disputes continued to occur in the frontiers of Chittagong and Tipperah, but the organized forays into that territory hardly assumed any nerratitve definite form untill 1823 (Wilson's Narrative of the Burmese War page 25), when a rupture ensued, which led to the war of 1824. The primary cause, therefore of all these disturbence, rendering the Burmese apt to provoke and take offence, was undoubtadly the emigration to our hills of tribes hitherto subject to their authority.

The origin of the tribes is a doubtful point, Pemberton ascribes to them a Maloy descent. Colonel Sir A. Phayire considers two of the principal tribes of Arracan, who are also found in these

hills to be of Myamma or Burmese extraction. Among the tribes themselves as record exists, save that of oral tradition, as to their origin. The Khyoungtha alone are possessed of a written language, thay have among them several copies of the Raja Wong, or History of the Kings of Arracan, but I have been able to discover no records whatever as to their sojourn and doings in the hills. The Tongtha, on the other hand posses no written character, and the languages spoken by them are simply to a degree expressin merely the wants and sensations of uncivilized life. The informationg obtainable as to their origin and past history is therefore naturally meager and unreliable (Page 32/33).

বাংলা ঃ এই চিঠিগুলো লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় পাওয়া। এগুলো পাওয়ার পর প্রায় সাথে সাথেই আরাকানের সর্দারের পরিচালনাধীন একদল সশস্ত্র কর্মী সৈন্য আমাদের শাসনাধীন এলাকায় ঢুকে পড়ে। আমাদের চট্টগ্রামের প্রধান ঐ একই জুন মাসে বাধ্য হয়ে বড় লাটের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিবেদনে এটা লিখে পাঠান যে, তাকে মৈত্রী রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অবজ্ঞা করা হয়েছে যদ্দরুণ আগে সশস্ত্র সৈনিকদের প্রত্যাহার দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, শরণার্থীদের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে অবশ্যই তাড়িয়ে দিতে হবে। তাতে তিনি এটাও যোগ করেন যে, উক্ত পলাতক লোকজন আরাকানে বহুবিধ দুষ্কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জনৈক চাকমা সর্দার যিনি আরাকান থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাকে তিনি নিজেই গ্রেফতার করে ধরে রেখেছেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করে স্বীয় বক্তব্য শেষ করেন যে, উক্ত সর্দার ও তার পরিচালনাধীন উপজাতীয় লোকদের নীচু ভূমিতে শান্তিপুর্ণ চাষবাদেও আগ্রহ নেই। তারা ইতোমধ্যে পাহাড়ে ও বনে আস্তানা গড়ে নিয়েছে যাতে লোট পাটের সুবিধা হয়। এর দশ বছর আগে ১৭৭৭ খ্রীঃ সালের ৩১ মে তারিখের আরেকটি চিঠি যেটি চট্টগ্রামের তদানিন্তন প্রধান কর্তৃক সম্মানিত বড় লাট ওয়ারেন হোষ্টিংসের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তাতে আছে, কয়েক হাজার পাহাড়ী লোক আরাকান থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে। তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্ববর্তী প্রধান প্রশাসক মিঃ বেটম্যান কর্তৃক পুনর্বাসন লাভের আশ্বাসে উদ্দীপ্ত। দেশ ত্যাগের এ জাতীয় প্রামাণ্য ঘটনাবলী বর্মী কর্তৃপক্ষের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিল। মেক ফার্লেন লিখিত ইতিহাস পুস্তক ব্রিটিশ ইন্ডিয়াম্বর ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে, ১৭৮৫ খ্রীঃ সালে আরেকবার ৫০০০ বর্মী সৈন্যের একটি বাহিনী কিছু বিদ্রোহী উপজাতীয় সর্দারদের যাদেরকে তারা ডাকাত বলে, বৃটিশ অধিকারভুক্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে পশ্চাদ্ধাবন করে। আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারী ঐসব সর্দারদের কয়েকজনকে ধরে তখন বর্মীদের কাছে হস্তান্তর করাও হয়, যাদের মোট তিনজনের দু'জনকে ভীষণ উৎপীড়নের দ্বারা মেরে ফেলা হয়।

মেক ফার্লেন আরো উল্লেখ করেন, ১৮০৯ খ্রীঃ সালেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার সীমান্তে বিরোধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ সালের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত ঐসব সংঘাত সংঘর্ষ কমই সফলকাম হতে পেরেছে বা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। (উইলসন্স লিখিত নেরেটিভ অব দি বার্মিজ ওয়ার পৃষ্ঠা ২৫)।

ঐ সময় সংঘটিত ঘটনাবালী ১৮২৪ সালের যুদ্ধকে অনিবার্য্য করে তুলে। দেখা যায়, এসব অশান্তির সূচক হলো এমন একটি কারণ, যা বর্মীদের ধৈর্য্যচ্যুত আর দোষ গ্রহণে বাধ্য করে। নিঃসন্দেহে সে কারণটি হলোঃ উপজাতীয় লোকদের স্বদেশ ত্যাগ করে, আমাদের পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ, যা তাদের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত।

উপজাতীয় মৌলিকত্বের ব্যাপারটি সন্দেহপুর্ণ। পেম্বারটন তাদেরকে মালয়ী বংশোদ্ভুত বলে নির্ণয় করেন। কর্ণেল স্যার এ ফেইর অনুমান করেন, আরাকানের প্রধান যে দুটি উপজাতি, যাদের অনেককে এই পাহাড়াঞ্চলেও পাওয়া যায়, তারা মূলতঃ মায়াম্মা বা বর্মী লোকোদ্ভুত। উপজাতীয়দের নিজেদের মৌখিক পুরাকাহিনী ব্যতীত মুল জন্ম বৃত্তান্তের কিছুই লিপিবদ্ধ আকারে প্রাপ্তব্য নয়। খিয়াংথা পরিচিত লোকদেরই কেবল লিখিত ভাষা আছে। তাদের কাছে বহুসংখ্যক 'রাজাওং' বা আরাকানের রাজাদের ইতিহাস নামক পুস্তিকা পাওয়া যায়।

কিন্তু আমি তাদের প্রবাস ও পর্বত বাসের জীবন বৃত্তান্তের উপর কোন তথ্যই অবগত হতে পারিনি। অপর পক্ষে 'টংথাম্ব নামীয়রা কোনরূপ লেখশৈলীর অধিকারী নয়। তাদের কথাবার্তা হলো কোন মতে চাতিদাকে ব্যক্ত করা, যা অসভ্য জীবনের অভিব্যক্তি। তাদের মৌলিকত্ব আর অতীত ইতিহাসের তথ্য স্বভাবতই অপ্রতুল আর অবিশ্বাস্য। (সূত্র ঃ ঐ পৃঃ ৩২/৩৩)

১৫৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

এই সাথে কিছু কর্তৃপক্ষীয় মূল্যায়ন বিবেচ্য, যথাঃ-

১। The Most reasonable accunt of their origin is that they are the products of unions between the Nowab Saista Khan's solder's and mogh women, and that the clan was formed within the last 200 years or so.

(Ref : Selection from the corespondence on the revenue administration of Chittagong Hill Tracts. pge-276)

বাংলা ঃ তাদের মৌলিকত্বের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা হলো, তারা নবাব শায়েস্ত খাঁর সৈন্যবাহিনী ও মগ স্ত্রীলোকদের পারস্পরিক মিলনজাত প্রজন্ম। গত দুশত বছর বা অনুরূপ সময়ের ভিতরে তাদের বর্ন ও শাখা প্রশাখার উদ্ভব হয়েছে। (সুত্র পার্বত্য চট্টগাম রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত চিঠিপত্র সংগ্রহ্ পৃঃ ২৭৬)

২। The Chakma's are mongoloed race, probably of Arakanies origin. Though they have inter merried largely with Bengalies. They are divided in three subtribes. Chakma, Duingnak and Tanchangya. The Duingnak broken away from the main tribe a century ago and flied to Arakan, Of later years some have returned to cox's bazar sub-division of Chittagong districts, (Ref : Provincial Gazatteer of India Page 410/1941)

বাংলা ঃ চাকমারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক, সম্ভবতঃ আরাকানী মূল থেকে উদ্ভুত। যদিও তারা বাঙ্গালীদের সাথে ব্যাপকভাবে আন্তঃ বিভাহে আবদ্ধ, তবু তারা নিজেদের মাঝে তিন শাখা উপজাতিতে বিভক্ত যথা চাকমা, ডুইংনাক ও টঞ্চঙ্গ্যা। শতাব্দীকাল আগে ডুইং নাকেরা মূল সমাজ থেকে পৃথক হয়ে আরাকানে চলে গিয়েছিলো। কয়েক বছর আগে তাদের কিছু লোক পুনরায় চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার মহকুমা এলাকায় ফিরৎ এসেছে।

(সূত্র প্রভিন্সিয়েল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডেয়া পৃঃ ৪১০/১৯৪১)

৩। The tribes consider themselve descendants of emigrants from Bihar, who came over and setlled in this part in the days of the Arakanies kings. (Ref : An Account of Chittagong Hill Tracts, by S. H, Hutchinson Page 89)

বাংলা ঃ এই চাকমা উপজাতীয় লোকজন নিজেদেরকে দেশত্যাগী ঐ সব বিহারবাসীদের

বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভুখণ্ডে আরাকানী রাজাদের শাসনকালে আসে ও আবাস গড়ে তোলে। (সুত্র ঃ এন একাউন্ট অফ চিটাগাং হিলট্রাক্টস ঃ এস এইচ, হাচিনসনঃ পৃ-৮৯)।

৪। তখন এতদাঞ্চলে (আরাকানে) কিছু পশ্চিমা লোক বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাদের অনেকের উপাধি ছিলো শেখ যা থেকে থেক বা স্যাক নামের উৎপত্তি হয়েছে।

(সুত্র ঃ জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল সংখ্যা ১৪৫/১৮৪৪ পৃঃ ২০১-২ কর্নেল ফেইর লিখিত প্রবন্ধ।)

৫। চাকমাগণ মগ নারী ও মোগল সৈনিকদের মিলনজাত বংশধর। সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমাদের অনেকেই মোগল ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের অনুগত হয় এবং খোদ চাকমা প্রধানরা ও মুসলমানী নাম ও খেতাব ধারণ করেন। পরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তারা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষাবধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে, এবং হিন্দু প্রভাব অন্তর্হিত হয়।

(সূত্র ঃ সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৩১ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ)

৬। চাকমাগণ আধা বাঙ্গালী। বস্তুতঃ তাদের পোশাক পরিচ্ছদ আর ভাষাটিও একজাতের বিকৃত বাংলা। এতদভিন্ন তাদের উপাধিসহ নামগুলিও এমন বাঙ্গালী ভাবাপন্ন যে, তজ্জন্য তাদেরকে বাঙ্গালী সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন করা প্রায় অসম্ভব।

(সূত্র ঃ (১) মিঃ জীম বীম সেন কমিশনার চট্টগ্রাম-এর চিঠি নং-২২৭ এইচ/তাং ৫, ৯, ১৮৭৯ ইং)

(২) চাকমা জাতির ইতিবৃত্তঃ বিরাজ মোহন দেওয়ান পৃঃ ১১)।

৭। প্রচলিত মগ জনশ্রুতিঃ কোন এক সময় চট্টগ্রামের জনৈক উজির আরাকান রাজার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। পথিমধ্যে এক শুদ্ধাচারী ফুঙ্গী, উজির সাহেবকে আহারের নিমন্ত্রণ দেন। খাবার দিতে দেরী হওয়ায় উজির সাহেব জনৈক সৈনিককে তার কারন অনুসন্ধানে পাঠান। সৈনিকটি ফিরে এসে তাঁকে জানায় যে, ফুঙ্গী নিজের পা চুলাতে স্থাপন করেছেন ও তা থেকে আগুন জ্বলছে তাই দেরী। এই সংবাদে উজির সাহেব রাগান্বিত হয়ে চলে যান। ইতোমধ্যে ফুঙ্গী খাদ্যাদিসহ এসে দেখেন উজির সাহেব ও তাঁর সঙ্গীরা নেই। তাতে তিনি মনোক্ষুণ্ন হয়ে অভিশাপ দেন। পরিশেষে উজির সাহেব সসৈন্যে পরাজিত ও বন্দি হন, চাকমারা তাদের মগ স্ত্রীজাত বংশধর।

১

সংশোধিত পাঁচদফা দাবীনামার উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতামত

সংশোধিত পাঁচদফা দাবীর ক্রমিক নম্বর ১ (১) (ক) হইতে (চ) পর্যন্ত

১। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন* (Amendment) *করিয়া-*

(১)(ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা;

(খ) আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council) *সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা;*

(গ) এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল থাকিবে;

(ঘ) আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, উপআইন, আদেশ, নোটিশ প্রণয়ন, জারী ও কার্যকর করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইবে;

(ঙ) পরিষদের তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সাথে সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবার ক্ষমতা এই পরিষদের হাতে থাকিবে।

(চ) আঞ্চলিক পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে -

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন -শৃঙ্খলা; ২। জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমুহ; ৩। পুলিশ; ৪। ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৫। কৃষি, ও কৃষি উদ্যান উন্নয়ন; ৬। কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা; ৭। বন, বন সম্পদ সংরক্ষণ উন্নয়ন; ৮। গণস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা; ৯। আইন ও বিচার; ১০। পশুপালন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ; ১১। ভূমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্ত; ১২। ব্যবসা -বাণিজ্য; ১৩। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প; ১৪। রাস্তা-ঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা; ১৫। পর্যটন; ১৬। মৎস্য, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ; ১৭। যোগাযোগ ও পরিবহন; ১৮। ভূমি রাজস্ব, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর ধার্য করণ; ১৯। পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ; ২০। হাট-বাজার ও মেলা; ২১। সমবায়; ২২। সমাজ কল্যাণ; ২৩। অর্থ; ২৪। সংস্কৃতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান; ২৫। যুবকল্যান ও ক্রীড়া; ২৬। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা; ২৭। মহাজনী কারবার ও ব্যবসা; ২৮। সরাইখানা, ডাক বাংলা, বিশ্রামাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদি; ২৯। মদ, চোলাই উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ; ৩০। গোরস্থান ও শ্মশান; ৩১। দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনাগার; ৩২। জল সম্পদ ও সেচ ব্যবস্থা; ৩৩। জুম চাষ ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসন; ৩৪। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৩৫। কারাগার; ৩৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সরকারের বক্তব্য ঃ পার্বত্য জেলা সমুহ বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা বিধায় উহাদিগকে বিশেষ এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়া উহাদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে ১৯৮৯ সনে প্রণীত স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন তিনটির অধীনে ইতিমধ্যে উক্ত তিনটি জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। উপরোক্ত ১ (চ) -তে উল্লেখিত বিষয়গুলির মধ্যে অধিকাংশই ইতিমধ্যে পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। বাকী বিষয়গুলি সামগ্রীক জাতীয় স্বার্থে, স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রশাসনের অবকাঠামো, স্থানীয় অবস্থা ও পরিষদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং বাস্তবতার নিরিখে হস্তান্তর করা সম্ভব নহে। উক্ত আইন অনুযায়ী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পরিষদে উপজাতীয়দের মধ্য হইতে উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন নির্বাচিত চেয়ারম্যান সহ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচনের বিধান রাখা হইয়াছে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত পরিষদ সমূহকে আইনের অধীন প্রবিধান প্রণয়ন করা, কর আরোপ করা ও বাজেট প্রণয়ন করার ব্যাপারেও পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।
উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষীতে আর কোন আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রয়োজন নাই।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য বস্তুগত ও যথাযথ নহে। অতএব, ১ (১) (ক) - (চ) পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির দাবী পুরণ করা হয় নাই। কেননা-
(১) ১৯৮৯ সালে প্রণীত তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন হইতেছে সংসদীয় আইন, সাংবিধানিক আইন নহে। বস্তুতঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সাংবিধানিক আইনে পরিণত করিলেও তাহা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমিস্বত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করিতে পারিবে না। পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন তিনটির মুখবন্ধে রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনকে বিশেষ এলাকা হিসাবে উল্লেখ করা হইলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে 'পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা' প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কোন আইন প্রণয়ন করা হয় নাই। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করার দাবী পূরণ করা হয় নাই।

(২) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন বাংলাদেশ সংবিধানের ৯,২৮ ও ৬৫ নম্বর অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদ সমূহের ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক কেবল মাত্র স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নারী ও শিশু অথবা সাধারণভাবে নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের জন্য উন্নয়নমূলক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সংসদীয় আইন দ্বারা যেকোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপআইন বা আইনগত কার্যকারিতা সম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা সম্ভব। সুতরাং পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বস্তুতঃ স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান বিশেষ। তাই এই স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের হাতে আইনগত, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা,বিচার ইত্যাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ও সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর মুখাপেক্ষী বিধায় এই সব পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, এই স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানগণ উপমন্ত্রী পদমর্যাদাসম্পন্ন হইলেও তাহার তথা পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। বস্তুতঃ জেলা প্রশাসকের হস্তে (ডেপুটি কমিশনার) সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসন, অর্থনৈতিক, বিচার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন তথা সকল ক্ষেত্রে সর্বাধিক

ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। সর্বোপরি ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনানুসারে বহিরাগত সমতল ভূমির অধিবাসীদের মধ্য হইতেও পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিতে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার সংরক্ষণসহ বিচার, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জুম্ম জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে যে পরিমাণের আইনগত অধিকার স্বীকৃত ছিল দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও ১৯৮৯ সনে প্রণীত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে তাহার চাইতে অধিকতর কম অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বরঞ্চ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তিকরণ এবং অর্থনৈতিক ও ভূমির অধিকার খর্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং এই পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হইয়াছে বলা যায় না।

(৩) ১৯৮৯ সনে প্রণীত স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন মোতাবেক পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের জন্য প্রতিনিধিত্বের যে ব্যবস্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ ও এর কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সাথে কোন সংগতি নাই। এই পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে বে-আইনী বহিরাগতদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যাহা পুরাতন বস্তি বাঙ্গালীদের সহ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদে প্রতিনিধিত্ব ও এর কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের দাবী পুরণ হয় নাই।

(৪) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে কেবলমাত্র সরকারী পূর্বানুমোদন ক্রমেই সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে প্রবিধান প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। ইহা সমিতির পেশকৃত দাবীর সাথে অসংগতিপূর্ণ ও উক্ত দাবী পূরণ করিতে পারে নাই।

(৫) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্বাধীনভাবে বাজেট প্রণয়ন করিবার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নয়। পার্বত্য জেলা পরিষদে সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে বাজেট তৈয়ারী ও সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং 'আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সাথে সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবার ক্ষমতা এই পরিষদের হাতে থাকিবে' -সমিতির এই দাবী পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন পূরণ করিতে পারে নাই।

(৬) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের হাতে প্রথম তফসিল মোতাবেক ২২টি বিষয়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পেশকৃত বিষয়সমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ নহে। কারণ সমিতি কর্তৃক পেশকৃত দাবী - পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ ভূমি সংরক্ষণ, উন্নয়ন, ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্ত, আইন ও বিচার, অর্থ, স্থানীয় শাসন ইত্যাদি কতিপয় বিষয় পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই। বিশেষতঃ পার্বত্য জেলা পরিষদে যে সকল বিষয়ের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সে সব বিষয়ের কার্যপরিধি তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রসংগতঃ দুইটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, প্রথমতঃ এই পর্যন্ত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদকে শুধুমাত্র তিনটি বিষয় - স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং কৃষি সম্প্রসারণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে যদিও পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রদত্ত অধিকাংশ বিষয় ইতিমধ্যে দেওয়া

হইয়াছে বলিয়া সরকার দাবী করেন। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, যে তিনটি বিষয়ের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের জেলা পরিষদসমূহের যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে অনুরূপ বিষয়সমূহই পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদেও অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। অতএব, উল্লেখিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে ইহা অত্যন্ত সহজভাবে বলা যাইতে পারে যে - 'পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আর কোন আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রয়োজন নেই' - সরকারের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য।

পক্ষান্তরে সমিতির সংশোধিত দাবীনামার ১ (১) (ক) হইতে (চ) পর্যন্ত দাবী পরিপুরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কারণ -

(১) যেহেতু চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা,মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমি, খিয়াং ও চাক ভিন্ন ভাষাভাষী এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, ধর্ম-ভাষা ও স্ব-শাসন লইয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। ভারতের বৃটিশ সরকার ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি প্রণয়ন করিয়া জুম্ম জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। ইহার পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও উক্ত শাসন বিধি পুনরায় স্বীকৃতি প্রদান করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা দেওয়া হয়। তৎপরে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তভুক্ত হইলেও পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রেও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালের পহেলা মার্চ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এই দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রেও 'উপজাতীয় অঞ্চল' শব্দ ব্যবহার করতঃ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি বলবৎ রাখিয়া উপজাতীয় অঞ্চলের মর্যাদা স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। অতএব, ঐতিহাসিক দিক হইতেও এ দাবীর যৌক্তিকতা ও যথার্থতা রহিয়াছে। (২) যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অনুন্নত ও পশ্চাদপদ অঞ্চল। এখানকার ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণ তুলনামূলক ভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাইতে অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ। তাহাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রথা, অভ্যাস, সামাজিক রীতি-নীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক ও মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন যাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনের এই স্বাতন্ত্র রক্ষা ও বিকাশ সাধন করা একান্ত বাঞ্চনীয়। সুতরাং জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণার্থে ও জুম্ম জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিকাশ সাধনের লক্ষে আঞ্চলিক পরিষদ সহ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দাবীর যৌক্তিকতা ও যথার্থতা রহিয়াছে। (৩) যেহেতু বৃটিশ শাসন আমল হইতে আজ অবধি জুম্ম জনগণ সকল ক্ষেত্রে শোষিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হইয়া আসিতেছে। ফলশ্রুতিতে ভিন্ন ভাষাভাষী ১০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আজ চির বিলুপ্তির পথে। জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ও অনগ্রসরতা সর্বোপরি জুম্ম জনগণের সরলতা ও সহজ জীবন যাত্রার সুযোগে তুলনামূলক ভাবে অধিকতর উন্নত ও

অগ্রসর বৃহত্তর জনগোষ্ঠির একাংশের কর্তৃত্ব, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ আমলে এই ধারা অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পাকাপোক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অধিকতরভাবে অনুন্নত ও পশ্চাদপদ জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সাথে সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ফলশ্রুতিতে জুম্ম জনগণ প্রশাসনিক ক্ষমতা হইতে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এবং স্বীয় ভিটামাটি হইতেও উচ্ছেদ হইয়া তাহাদের অর্থনৈতিক অধিকার ও ভূমিস্বত্ব হারাইতে বসিয়াছে এমতাবস্থায় জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমিস্বত্ব ও মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণ রূপে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্বসহ ভূমি ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ সহ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রদানের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা অনস্বীকার্য। (৪) যেহেতু ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও জাতীয় বিকাশ সাধন করিতে পারে নাই। অনুরূপ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ দ্বারাও জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভুমিস্বত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইতে পারে না। কারণ এই পার্বত্য জেলা পরিষদ অগণতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, কম ক্ষমতাসম্পন্ন ও ত্রুটিপূর্ণ। ফলতঃ এই পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্তৃক কয়েক লক্ষ বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়া অর্থনৈতিক অধিকারসহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভুমিস্বত্ব বিলোপের প্রক্রিয়া জোরদার করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসন ব্যতিরেকে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভুমিস্বত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং জুম্ম জনগণকে চির বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষার্থে ও তাহাদের সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা অতি দ্রুত গতিতে অবসান করিবার লক্ষ্যে সর্বোপরি বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আঞ্চলিক পরিষদসহ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রদানের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা অনস্বীকার্য।

(২)(ক) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমী ও চাক - এই ভিন্ন ভাষাভাষী দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ -এ সকল উপজাতিগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে এবং ইহাতে তাহাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ -এ জুম্ম জনগণকে 'উপজাতি' হিসাবে যে স্বীকৃতি এবং তাহাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা সাংবিধানিক উপায়ে প্রদান করা হয় নাই বিধায় এই স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ যথাযথ বলিয়া গণ্য করা যায় না। সংশ্লিষ্ট আইনে কেবলমাত্র উপজাতি শব্দ ব্যবহার এবং নামে মাত্র উপজাতিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে কিছু শব্দ সংযোজন করতঃ জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় অস্তিত্বের স্বীকৃতি নিশ্চিত ও পুর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। এই স্বীকৃতি প্রদান অবশ্যই সাংবিধানিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি 'বিশেষ শাসনবিধি' অনুযায়ী শাসিত হইবে সংবিধানে এইরকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের মাধ্যমে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ বিশেষ শাসিত এলাকা হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ব্যবস্থার জন্য সংবিধানে কোন স্বতন্ত্র আইন অথবা সংবিধি ব্যবস্থা নাই। সুতরাং সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে সরকারের এই বক্তব্য যথার্থ হইতে পারে না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য বিবিধ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সংবিধানে বিশেষ শাসনবিধির জন্য আইন থাকা বাঞ্ছনীয়। সংবিধানে এই প্রকারের কোন আইন অথবা সংবিধি ব্যবস্থা অনুপস্থিতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া এত জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে ও জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব আজ চির বিলুপ্তির পথে। ১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন হইতেছে একটি সংসদীয় আইন। সুতরাং এই আইনও বৃটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় ক্ষমতাসীন সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নানাভাবে সংশোধিত ও খর্ব হইতে পারে। তাই এই ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

(গ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া যেন কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ (Safeguard) এর ব্যবস্থা ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের মাধ্যমে রাখা হইয়াছে।

সমিতির বক্তব্য ঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য সঠিক হইতে পারে না। কারণ ১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন হইতেছে একটি সংসদীয় আইন। তাই এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান যে কোন সময়ে বাতিল অথবা সংশোধন হইতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ এই আইনের ৬৪ নম্বর ধারায় বর্ণিত বিষয়বস্তু সাপেক্ষে ইহা সুস্পষ্ট যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫০৮৯ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র ৪৪৬.০৪ বর্গমাইল (৮.৭৬%) এলাকা তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদে অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। আর অবশিষ্ট ৪৬৪২.৯৬ বর্গমাইল (৯১.২৪%) এলাকা সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ এলাকা, বেতবুনিয়া ভু-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইয়াছে। সুতরাং পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে পরিমান ভুমি প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে এই বিধান প্রয়োগের তেমন কোন অবকাশ নেই।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, বস্তুতঃ কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা পাহাড় ও জমিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল প্রকারের পাহাড় ও ভুমির মালিকানা হইতেছে জুম্ম জনগণের। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা স্বতন্ত্র

বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে অপরাপর অঞ্চল হইতে যাহাতে কেহ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে সেই রকম বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই আইন সংবিধানিক না হওয়ার কারণে ক্ষমতাসীন সরকার ইচ্ছামত স্বীয় স্বার্থে প্রয়োগ করতঃ এই আইন নানাভাবে খর্ব করিয়া জুম্ম জনগণকে সর্ব প্রকারের জমি ও পাহাড়ের মালিকানা হইতে বঞ্চিত করিতেছে। ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার বহিরাগতদের নিকট কাপ্তাই হ্রদে জলেভাসা জমি ও পাহাড়সহ জুম্ম জনগণের বন্দোবস্তকৃত বা দখলকৃত পাহাড় ও জমি বেআইনীভাবে খাস জমি নামে বন্টন করা হইতেছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে সেই রকম আইন বিধি (Inner Line Regulation) *প্রণয়ন করা। তবে শর্ত থাকে যে, কর্তব্যরত সরকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।*

সরকারের বক্তব্য ঃ প্রস্তাবটি সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

সমিতির মতামতঃ এই ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য যথার্থ নহে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ও পশ্চাদপদ এবং তাহাদের উপর জাতিগত ও শ্রেণীগত শোষণ ও নিপীড়ন বিদ্যমান। জুম্ম জনগণকে এই সব শোষণ ও নিপীড়ন হইতে মুক্ত রাখিয়া দ্রুত বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিতে হইলে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ প্রবেশ ও চলাফেরার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা অত্যন্ত অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ অধিকতর উন্নত ও অগ্রসর বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া জুম্ম জনগণের টিকিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাহাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্যও বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের নাগরিকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও অবাধ চলাচলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের নাগরিকদের অনুমতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও অবাধ চলাফেরার ব্যবস্থা থাকিলে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। কেননা অপরাপর অঞ্চলের নাগরিকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতঃ স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তথা স্থায়ী অধিবাসীদের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে বিজড়িত হইতে বাধ্য। ফলতঃ নানা ক্ষেত্রে বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। সে ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণের পক্ষে কোন অবস্থাতেই টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইবে না। পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে চরম অশান্তিপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক অবস্থা ও পরিস্থিতি উদ্ভব হইতে বাধ্য যাহা সমগ্র দেশের স্বার্থ পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে। এই সব অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করিয়া তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও চলাফেরার ক্ষেত্রে ৫১ ধারা [51. Expulsion of Undesirables:- If the Deputy Commissioner is satisfied that the presence in the district of any person, who is not a native of the district, is or may be injurious to the peace or good

administration of the district, he may, for reasons to be recorded in writing, order such person if he is within the district to leave the district within a given time or if he is outside the district forbid him to enter it.

Whoever disobeys or neglects to comply with any order passed under this rule shall be punishable with imprisonment which may extend to two years, or with fine or with both.

51A. (1) If the Deputy Commissioner is satisfied that it is necessary in the interests of peace, good administration and the welfare of the district, to pass any order restricting or controlling trade, or to compel certain persons or class of persons to take certain order with property in their possession or under their management, he may, for reasons to be recorded in writing and with the previous sanction of the commissioner, pass any general or special order to this end.

(2) Such order shall not, unless renewed, be valid for a period longer than three months.

(3) In case of emergency, such order be passed by the Deputy Commissioner subject to confirmation by the Commissioner within fifteen days.] ও ৫২ ধারা

[52. Immigration into the Hill Tracts - (A) Save as hereinafter provided, no person other than a Chakma, Mogh or a member of any hill tribe indigenous to the Chittagong Hill Tracts, the Lusai Hills, the Arakan Hill Tracts, or the State of Tripura shall enter or reside within the Chittagong Hill Tracts unless he is in possession of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion.

(c) Every application for a permit shall (i) be in the form of a petition bearing a court-fee stamp of annas twelve, (ii) be accompanied by a certificate form the District Magistrate or Sub-divisional Officer of the district or sub-division in which the applicant resides that he bears a good character, has not been concerned in any crime or political movement, and has satisfactory means of livelihood, (iii) state the purpose for which, the period during which, and the areas within which, the applicant seeks permission to remain in the Chittagong Hill Tracts, and (iv) state the Thana at which the applicant desires to receive his permit.

(k) Any person required by this rule to be in possession of a permit who is found within the boundaries of the Chittagong Hill Tracts without such permit or conducts himself otherwise than in accordance with any directions contained in the permit shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to three years, or with fine or with both. (1) Every person required by this rule to be in possession of a permit shall be bound to produce it on the demand of any Government Officer, Headman, Karbari or Bazar Choudhuri, and on his failure to produce such permit such

Government Officer, headman, Karbari or Bazar Choudhuri shall arrest him and forward him without delay to the nearest police Officer or Magistrate. In making an arrest under this clause the government Officer, Headman, Karbari or Bazar Choudhuri may require the assistance of any person, and such person shall be bound to render assistance in effecting the arrest, and in keeping the offender in detention till he is handed over to a police officer of magistrate.] মধ্য দিয়া বিধি নিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল। এছাড়া পাকিস্তান সরকারের আমলেও এই বিধি নিষেধ বলবৎ ছিল যদিও এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা এই বিধি নিষেধ নানাভাবে খর্ব করা হইয়াছিল।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে - বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের কোন নাগরিক প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেই রকম আইন প্রণয়ন করা হইয়া থাকিলে তাহার অর্থ এই নয় যে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোটেও কোন নাগরিক প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা কেবলমাত্র অনুমতি লইয়া শৃঙ্খলা সহকারে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও চলাফেরা করিবার একটা ব্যবস্থা মাত্র। বস্তুতঃ বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের যে কোন নাগরিক বৈধভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও চলাফেরা করিতে পারিবেন এবং নিয়মানুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে সক্ষম হইবেন। সর্বোপরি প্রসংগতঃ ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪ নম্বর, ২৮ নম্বর এবং ৩৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত যথাক্রমে - "জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা", "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না" এবং "জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা ও বসতি স্থাপন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে"- এইসব আইনের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের ও বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে Inner Line Regulation প্রণয়ন করা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়ার কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এই Inner Line Regulation ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। পাকিস্তানের কোরাম, খাইবার, মালাকান্দ ইত্যাদি উপজাতি অঞ্চল সমূহ ও ভারতের জম্মু কাশ্মীর, মিজোরাম, অরুনাচল ইত্যাদি রাজ্যে এই Inner Line Regulation দ্বারা অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের অবাধ প্রবেশ এবং বসবাস নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া আসিতেছে। তাই প্রস্তাবটি (দাবী) সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলা যায় না। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রামের জম্মু জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভুমিস্বত্ব ও মৌলিক অধিকার যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ এবং অঞ্চলস্থ সার্বিক পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির লক্ষ্যে উক্ত অবাধে প্রবেশ ও চলাফেরার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ Inner Line Regulation সাংবিধানিক ভাবে আইন প্রণয়নকরণ একান্তই অপরিহার্য। বলা বাহুল্য এতে রাষ্ট্রীয় চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হইয়া যাইবার কোন আশংকা থাকিতে পারে না। অতএব, এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

(ঙ) (১) গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাইয়ের ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন (Amendment) *যেন না করা হয় সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।*

সরকারের বক্তব্য ঃ প্রস্তাবটি সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

সমিতির মতামত ঃ দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের রাজনৈতিক দল ও সংগঠন রহিয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সমূহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকার কি পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন ও দেশ শাসন করিবেন ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব, জুম্ম জনগণের জন্য কেবল মাত্র বিশেষ অধিকার প্রদান করা যথেষ্ট হইতে পারে না। উক্ত প্রদত্ত বিশেষ অধিকার যাহাতে অগণতান্ত্রিক উপায়ে খর্ব হইতে না পারে তজ্জন্য সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই জুম্ম জনগণের মতামত যাচাইয়ের ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন যেন না করা হয় সেই ধরণের সংবিধি ব্যবস্থা প্রণিত না হইলে জুম্ম জনগণের জন্য যে বিশেষ অধিকারই প্রদান করা হউক না কেন তাহার কোন স্থিতিশীলতা ও স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভবপর নহে। অতীতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাইয়ের ব্যতিরেকে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন করা হইয়াছে এবং উহার ফলে জুম্ম জনগণের স্বার্থ চরম ভাবে ক্ষুন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, প্রস্তাবটি (দাবী) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হইলেও উপরোক্ত যুক্তি সাপেক্ষে অত্র সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে একটি উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করতঃ প্রস্তাবটি পূরণ করা সম্ভবপর। অন্যথায় অগণতান্ত্রিক শাসক গোষ্ঠিরা নিজস্ব খেয়াল-খুশি অনুসারে সংবিধানে বিভিন্ন প্রকারের সংশোধনী এবং সংসদীয় আইন প্রণয়ন করিয়া জুম্ম জনগণকে বারে বারে অনিশ্চয়তার দিকে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে।

> *(২) আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাহাতে কোন আইন অথবা বিধি প্রণীত না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।*

সরকারের বক্তব্য ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ দেশের যে কোন এলাকা ও বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা আনয়নের অবকাশ নাই।

সমিতির মতামত ঃ এই ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী যথার্থতা থাকিলেও নিম্নোক্ত বিষয়াদি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে-

(১) বাংলাদেশের সংবিধানে যে সব আইন প্রচলিত রহিয়াছে সে সব আইনের বলে কার্যতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভুমি ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হইতেছে না। তাই জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে জাতীয় সংসদে মাত্র তিনটি আসন রহিয়াছে। সুতরাং ৩৩০ সদস্যকে জাতীয় সংসদের যেকোন বিলের ভোটাভোটিতে এই তিন জন নির্বাচিত সদস্যের কিছু করিবার থাকে না। সুতরাং জুম্ম জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সংসদে আনীত যেকোন বিল

সংসদে যথাযথভাবে পর্যালোচিত না হইয়া উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভবনা পুরোপুরিভাবে থাকিয়া যাইবে।

(৩) বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র। সুতরাং জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বতা চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সদস্যগণের পরামর্শ ও সম্মতি গ্রহণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্তর্গত। অন্যথায় জুম্ম জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী যে কোন বিষয়ে সংসদীয় আইন বা বিধি প্রণীত হওয়ার আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে।
অতএব, উপরোক্ত বিষয়াদির আলোকে ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার যে - আলোচ্য প্রস্তাব (দাবী) অনুসারে সংবিধান সংশোধন করতঃ কোন সংবিধি ব্যবস্থা প্রণীত হইলে তাহা সমগ্র দেশেরই মঙ্গল হইবে এবং ইহাতে জাতীয় সংসদের সর্বময় ক্ষমতার ব্যাপারে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা আনয়নের অবকাশ থাকিতে পারে না। তাই সরকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

(চ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা। তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এ জেলা পুলিশ গঠনের বিধান রহিয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এ জেলা পুলিশ গঠনের বিধান রহিয়াছে তাহা জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে। কেননা এই পুলিশ বাহিনীর হাতে যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সীমিত। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে এই পুলিশ বাহিনীর তেমন কোন ভূমিকা রাখা হয় নাই।

প্রসংগতঃ নিম্নোক্ত বিষয়াদি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে - (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীগণ অত্যন্ত অনগ্রসর ও অনুন্নত। তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভাষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অবস্থা স্বতন্ত্র ধরনের। ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ আলাদা বৈশিষ্ট্যের। তাই এ সবের সাথে সংগতি রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম এমন একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের লইয়া গঠন করা একান্তই অপরিহার্য।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক বৈশিষ্ট বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হইতে মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র হওয়াতে এতদঞ্চলের উদ্ভূত বিরোধ ও মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদিও স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য। সুতরাং কতকক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আইন, বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বাহিনী থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৩) জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক পরিবেশের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়া এজন্য বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্য হইতে একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করিয়াছিল।

অতএব, অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠনকল্পে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন একান্তই অপরিহার্য। তাই বর্ণিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকারের বক্তব্য যথাযথ হইতে পারে না।

(ছ) যুদ্ধ বা বহিঃআক্রমণ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হইলেও আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ কেবলমাত্র জাতীয় প্রয়োজনে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়া থাকে।

সমিতির মতামত ঃ অত্র প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট নহে। জাতীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলে জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও বিশেষ শাসিত এলাকা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাহা কার্যকর করা হইবে কিনা তাহা সরকারের বক্তব্যে স্পষ্ট নহে। যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথক শাসিত এলাকা হিসাবে শাসিত হইয়া থাকে এবং সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা দেওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হইয়া থাকিলে অথবা পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতিরেকে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা দেওয়ার অবস্থা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদদের আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জরুরী অবস্থা ঘোষণা না করা একান্তই যুক্তিসংগত এবং সেই কারণে সংবিধানে সে রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন একান্তই অপরিহার্য।

(জ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় সেই রকম আইন বিধি প্রণয়ন করা। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে উক্ত পদে নিয়োগ করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ পার্বত্য জেলাসমূহে সকল নন-গেজেটেড পদে স্থানীয় স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্য হইতে নিয়োগের বিধান সংশ্লিষ্ট আইনে রাখা হইয়াছে। অন্যান্য পদে কর্মকর্তা নিয়োগ জাতীয় ভিত্তিক নিয়োগ-নীতি অনুসরণ করা হয়।

সমিতির মতামত ঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্যের সাথে প্রস্তাব (দাবী) এর বিষয়বস্তু সংগতিপূর্ণ নহে। বস্তুতঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, ১৯৮৯ জুম্ম জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কার্যকর করিতে হইলেও কেবলমাত্র নন-গেজেটেড পদে স্থানীয় স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্য হইতে নিয়োগের বিধান যথেষ্ট হইতে পারে না। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য বিবেচনা করতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্য হইতে নিয়োগ করা একান্তই অপরিহার্য। তাই তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন বিধি প্রণয়ন করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

সংশোধিত পাঁচ দফা দাবীর ক্রমিক নম্বর ২ (১) হইতে (৫)

২/(১) (ক) রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন - এই তিনটি জেলা বলবৎ রাখিয়া একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ তিনটি পার্বত্য জেলা বলবৎ রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা বাস্তবসম্মত নহে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এই এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয়কারীর ভুমিকা পালন করিতেছে।

সমিতির বক্তব্য ঃ সরকারের বক্তব্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবাস্তব। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি ইতিহাস। এই ইতিহাসকে কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতেছে বিভিন্ন জাতিস্বত্বার ইতিহাস। বর্তমানে তিনটি জেলায় বিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম যুগ যুগ ধরিয়া ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত একটি অভিন্ন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট হিসাবে বিদ্যমান ছিল। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাই এই তিনটি জেলাকে একটি একক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করিবার মধ্যে জুম্ম জনগণের পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও সংহতি গভীরভাবে বিজড়িত। পরস্পর বিচ্ছিন্ন তিনটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্তিকরণ জুম্ম জনগণের ঐক্য, সংহতি ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে বিভক্তকরণ কোন অবস্থাতেই বাস্তবসম্মত হইতে পারে না। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, তিনটি জেলাকে বলবৎ রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা হইলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও শাসন কাঠামোগত কোন সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকিতে পারে না। অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হইতেছে একটি উন্নয়নমূলক সংস্থা। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা এক্ষেত্রে অসংগতিপূর্ণ ও অবাস্তব। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করিবার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

(খ) পাবর্ত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে "জুম্মল্যান্ড" (Jummaland) *নামে পরিচিত করা।*

সরকারের বক্তব্য ঃ প্রস্তাবটির পিছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ও যুক্তি নাই।

সমিতির বক্তব্য ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার কোন অংশবিশেষ নহে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম নামটি পরিবর্তন করা একান্তই অপরিহার্য। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামকে "জুম্মল্যান্ড" অথবা আলোচনা সাপেক্ষে অন্য কোন নামকরণ করা যাইতে পারে।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ অনেক আগেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসাবে 'স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স' বিভাগ গঠন করা হইয়াছে।

সমিতির বক্তব্য ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য অদ্যাবধি কোন পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় নাই। সুতরাং সরকারের বক্তব্য যথার্থ নহে।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের জন্য একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান রহিয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এ বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা সামন্ততান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক ও অপর্যাপ্ত। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের সম্পত্তি, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, অভ্যাস ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন। সর্বোপরি শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতিক, সামাজিক রীতি-নীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক ও মানসিক গঠন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রভৃতির ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণ ও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং জুম্ম জনগণের জন্য একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্তই অপরিহার্য।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসনসমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ তিনটি পার্বত্য জেলার তিনজন সংসদ সদস্যই উপজাতীয়। কাজেই এক্ষেত্রে উপজাতীয় জনগণের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব নিষ্প্রয়োজন।

সমিতির মতামত ঃ বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত তিন সাংসদ জুম্ম হইলেও বিদ্যমান পদ্ধতিতে পরবর্তীতে যে কেবল জুম্ম জনগণের মধ্য হইতে জাতীয় সংসদে সদস্য নির্বাচিত হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বর্তমানে তিনজন সাংসদ জুম্ম বলিয়া জুম্ম জনগণের জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন -সরকারের এই বক্তব্য অবান্তর ও অযৌক্তিক। অপরপক্ষে জুম্ম জনগণের যথাযথ ও সঠিক প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে জাতীয় সংসদের আসনসমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা একান্তই যুক্তিসংগত ও বাঞ্ছনীয়।

(৫)(ক) কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা (Power Project Centre Area), *বেতবুনিয়া ভু-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত* (Reserved) *বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।*

সরকারের বক্তব্য ঃ বনাঞ্চলসহ অন্যান্য শ্রেণীর জমির নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং স্থানীয় সরকার পরিষদ ইহার কর্তৃত্বে আছে।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য জনসংহতি সমিতির দাবীর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের বিধি অনুসারে মাত্র ৪৪৬.০৪ বর্গমাইল এলাকা স্থানীয় সরকার

পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে। বাকী ৪৬৪২.৯৬ বর্গমাইল এলাকা বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার বিধান করা হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

১। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল		৪৬৪২.৯৬	বর্গমাইল
(ক) বনাঞ্চল - উত্তর বন বিভাগ	(সংরক্ষিত)	৬১৭.০০	"
দক্ষিণ বন বিভাগ	(")	৩১৫.০০	"
শংখ বনাঞ্চল	(")	১২৮.২৫	"
মাতামহুরী বনাঞ্চল(")	১৬০.৭১	"	
অশ্রেণীবভুক্ত বনাঞ্চল	(")	৩১৬৬.০০	"
(খ) কাপ্তাই হ্রদ এলাকা		২৫৬.০০	"
২। তিন স্থানীয় সরকার পরিষদ আওতাধীন অঞ্চল		৪৪৬.০৪	"
মোট আয়তন		৫০৮৯.০০	বর্গমাইল

উল্লেখ্য, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন জুম্ম জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই আইন অনুযায়ী অতি অল্প পরিমাণ এলাকা স্থানীয় সরকার পরিষদের আওতাধীন করা হইয়াছে। তাই অত্র দাবী পূরণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যায় না।

(খ) কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা (Power Project Centre Area), *বেতবুনিয়া ভু-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা।*

সরকারের বক্তব্য ঃ প্রচলিত বিধি অনুসারে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা নির্ধারণ করা হয়।

সমিতির মতামতঃ প্রচলিত বিধি অনুসারে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা নির্ধারণ করা হইয়া থাকিলেও কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতবুনিয়া ভু-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত বিধির পরিবর্তে প্রণীতব্য বিশেষ শাসনবিধি অনুসারে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

(গ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ স্থানীয় সরকার পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন জমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর করা হইবে না যাহা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে উল্লেখ আছে। তবে জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর প্রচলিত আইন বিধি মোতাবেক হইয়া থাকে।

সমিতির মতামত ঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য অসংগতিপুর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ জুম্ম জনগণের আশা-আকাঙ্খা পুরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

তাহা ছাড়া স্থানীয় সরকার পরিষদের আওতাধীনে যে পরিমাণ জমি প্রদান করা হইয়াছে তাহার পরিমান অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং সমিতির প্রস্তাব অনুসারে জমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

(ঘ)পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন ব্যক্তির দ্বারা বেদখলকৃত ও অন্য কোন উপায়ে বন্দোবস্তকৃত বা ক্রীত বা হস্তান্তরকৃত সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমি ও পাহাড় প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ অবৈধভাবে দখলকৃত বা ক্রয়কৃত বা বন্দোবস্তকৃত কোন জমি সংক্রান্ত বিরোধ আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তির ব্যবস্থা আছে।

সমিতির মতামত ঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ এযাবৎ অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্য, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীসহ হাজার হাজার বহিরাগত বিভিন্ন প্রকারের ছল-চাতুরী ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধভাবে কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড় ও জমি দখল অথবা ক্রয় অথবা বন্দোবস্ত লইয়াছে। তাই জুম্ম জনগণের স্বার্থে এই জাতীয় সকল প্রকারের মালিকানা ও দখলকৃত স্বত্ব বাতিল করা এবং আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তির ব্যবস্থা না করিয়া ঐ সমস্ত জমি ও পাহাড় প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা আঞ্চলিক পরিষদের নিকট সরাসরি হস্তান্তর করা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট বা কোন সংস্থাকে যে সমস্ত জমি বা পাহাড় রাবার চাষ, বনায়ন অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে লীজ (lease) *বা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত জমির লীজ ও বন্দোবস্ত বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমি ও পাহাড় পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।*

সরকারের বক্তব্য ঃ রাবার চাষ বা বনায়নের জন্য বন্দোবস্তকৃত জমির লীজ বাতিল করা আইন সম্মত হইবে না।

সমিতির মতামত ঃ এক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের মালিকানা স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়া এযাবৎ বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের অনেক সরকারী কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশাজীবীকে রাবার চাষ ও বনায়নের জন্য লীজ অথবা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। তাই রাবার চাষ বা বনায়নের জন্য এসব লীজ অথবা বন্দোবস্তকৃত জমি জুম্ম জনগণের স্বার্থে সরাসরি বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমি ও পাহাড় আঞ্চলিক পরিষদের আওতাধীন করা বাঞ্ছনীয়।

(চ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত সকল এলাকা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক কোন এলাকা পরিত্যক্ত হইলে সরকারের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী উহার দখল ও ব্যবহার নির্ধারিত হয়।

সমিতির মতামত ঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সরকারের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনানিবাস, সামরিক ও আধা- সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হয় নাই। জুম্ম জনগণের বন্দোবস্তকৃত ও দখলকৃত জমির উপরেই এযাবৎ সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস স্থাপন করা হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সমস্ত ক্যাম্প ও সেনানিবাসের সকল এলাকা প্রকৃত মালিকের নিকট অনতিবিলম্বে ফেরৎ প্রদান অথবা আঞ্চলিক পরিষদের আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণ করা বাঞ্ছনীয়।

সংশোধিত পাঁচদফা দাবীর ক্রমিক নম্বর ৩ (১) হইতে (৪)

৩।(১) ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয়, বন্দোবস্ত বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিতেছে সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

সরকারের বক্তব্য ঃ পার্বত্য জেলা সমুহে জমি ক্রয় এবং বন্দোবস্তের ব্যাপারে যে বিধি নিষেধ আছে তাহার অতিরিক্ত কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা বা এই সংক্রান্ত কোন বিধান প্রণয়ন করা সংবিধানের পরিপন্থী হইবে।

সমিতির মতামতঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য অত্যন্ত অস্পষ্ট ও হতাশাব্যাঞ্জক। কারণ ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭ সাল হইতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী বহিরাগত অনুপ্রবেশ করিয়া ভূমি বেদখল ও বসতি স্থাপন করিয়াছে তাহাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে সরাইয়া লওয়ার বিষয়ে সরকার ইহার বক্তব্যে সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, সরকার এইসব বহিরাগতদের অনুপ্রবেশে যেমনি কোন বাধা প্রদান করিতেছে না তেমনি তাহাদেরকে নানাভাবে পূনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিতেছে। প্রসংগতঃ ইহা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে - জুম্ম জনগণ অত্যন্ত দরিদ্র, অনুন্নত ও পশ্চাদপদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকাংশই জুম চাষের উপর কোন না কোন ভাবে নির্ভরশীল। তাই এখানকার ভূমিমালিকানা স্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা স্বতন্ত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জুম্ম জনগণের জীবন যাত্রা মানের উন্নতি সাধন সর্বোপরি জুম্ম জনগণের মধ্যেকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি, পাহাড়, বনাঞ্চল ও সম্পদ যথাযথ ভাবে ভোগ করিবার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের পাশাপাশি এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়, ভূমি (কাপ্তাই হ্রদে জলেভাসা জমিসহ), বনাঞ্চল ও অন্যান্য সম্পদের মালিকানা স্বত্ব জুম্ম জনগণের জন্য সুনিশ্চিত করা একান্তই অপরিহার্য। এটি অত্যন্ত বাস্তব ও অনস্বীকার্য যে, হিংস্র বন্য জন্তু ও প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করিয়া জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের জমি ও পাহাড় আবাদ করিয়া বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে এবং বলা বাহুল্য এতদঞ্চলের পাহাড়, ভূমি, বনাঞ্চল ও অন্যান্য সম্পদ সবচাইতে বেশী দক্ষতার সাথে

ব্যবহার করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে সর্বাধিক অবদান রাখিতে সক্ষম। এই মর্মকথা অনুধাবন করিতে সক্ষম হওয়ায় বৃটিশ সরকার জুম্ম জনগণের পাহাড়, ভূমি, বনাঞ্চল ও অন্যান্য সম্পদের অধিকার সুনিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৩৪, ৪১, ৪১ (ক), ৪৫, ৪৫ (ক), ৫০ (১), ৫০ (২)-তে ধারা আনয়ন করিয়া জুম্ম জনগণের ভূমি, পাহাড়, বনাঞ্চল ও সম্পদের অধিকার অনেকটা সুনিশ্চিত করিয়াছিল। অবশ্য পরবীর্ত সময়ে পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়কার সরকার কর্তৃক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে জুম্ম জনগণের সম্পদ ও ভূমি অধিকারের রক্ষাকবচ এসব বিধান নানাভাবে সুকৌশলে খর্ব করা হইয়া থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত এসব বিধান অত্যন্ত কড়াকড়ি ভাবে মানিয়া চলা হইয়াছিল। কিন্তু দেশ বিভক্তির সাথে সাথে জুম্ম জনগণের এসব মৌলিক অধিকারের উপর একের পর আরেকটা আঘাত আসিতে থাকে। ফলতঃ পাকিস্তান শাসনামলে পঞ্চাশ দশকের গোড়া হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন করিয়া বেআইনীভাবে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বসতি স্থাপন শুরু হইয়া যায়। বিশেষতঃ ১৯৫০ সালে ও ১৯৬০ সালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও বিহার রাজ্য হইতে আগত/বিতাড়িত বাংঙালী মুসলমান উদ্বাস্তুদের/শরণার্থীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বেআইনীভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ইহারই পাশাপাশি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে অব্যাহতভাবে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, জমিক্রয়, বন্দোবস্ত, বেদখল ও বসতি স্থাপন চলিতে থাকে। ১৯৬৫ সাল হইতে বেআইনী বহিরাগতের বসতি স্থাপন সহ সুকৌশলে ভূমি ক্রয়, জোরপূর্বক দখল ও দুর্নীতির মাধ্যমে বন্দোবস্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা অত্যন্ত লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত করিয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী ফেনী উপত্যকার মাটিরাংগা, মানিকছড়ি ও রামগড় এলাকার জুম্ম জনগণকে উৎখাত করিয়া তদঞ্চলের বহিরাগত বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে বেআইনীভাবে ব্যাপকভাবে পুনর্বাসন প্রদান করিয়া থাকে।

ফলশ্রুতিতে জুম্ম ও অজুম্ম (বাঙ্গালী) জনসংখ্যার অনুপাত ১৯৪৭ সালে যেখানে জুম্ম ৯৮.৫ % আর অজুম্ম ১.৫ % ছিল, তাহা ১৯৭১ সালে ৮৫% . ১৫% এ আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর বিশেষতঃ ১৯৭৮-৭৯ সাল হইতে এই বেআইনী অনুপ্রবেশ, ভূমি ও পাহাড় বেদখল দুর্নীতির মাধ্যমে ক্রয় ও বন্দোবস্ত এবং বসতি স্থাপন চলিতে থাকে। ফলে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম পাহাড়ী ও অজুম্ম (বাঙ্গালী) জনসংখ্যা অনুপাত জুম্ম ৫২ %: বাঙ্গালী ৪৮% এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রসংগতঃ ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পাকিস্তান শাসন আমল হইতে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়াই বেআইনী বহিরাগতদেরকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লঙ্ঘন করিয়া সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ও এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হইয়া আসিতেছে। ইহাতে অবশ্যই জুম্ম জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করিয়া দেওয়া হইতেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান গ্রন্থ -১৯৮৭ পৃষ্ঠা -৩২ পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫০৮৯ বর্গমাইল। তন্মধ্যে বনাঞ্চল ৪৫৬৯ বর্গমাইল, নদী এলাকা ২১ বর্গমাইল

এবং জমি এলাকা ৪৯৯ বর্গমাইল। আর এই ৪৯৯ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে কাপ্তাই হ্রদ এলাকা ২৫৬ বর্গমাইল। এই এলাকা বাদ দিলে অবশিষ্ট মাত্র ২৪৩ বর্গমাইল (অর্থাৎ ১,৫৫,৫২০ একর) লইয়া জমি এলাকা গঠিত। পুরাতন বস্তি বাঙ্গালীসহ জুম্ম জনগণের লোকসংখ্যা যদি বর্তমানে ৭ লক্ষও ধরা হয় তাহা হইলে মাথা পিছু জমির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ০.২২ একর। পক্ষান্তরে সমগ্র বাংলাদেশে মাথাপিছু গড়পড়তা জমির পরিমাণ ০.২৯ একর। এই তথ্য হইতে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেবল মাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সমপরিমান চাষযোগ্য জমি পার্বত্য চট্টগ্রামে নাই। ফলে জুম্ম জনগণের সাথে বেআইনী বহিরাগতদের বিরোধ চরম আকার ধারন করিয়াছে। এই বিরোধের অন্তর্নিহিত কারণ হইতেছে ভূমি বেদখলের সমস্যা। প্রসঙ্গতঃ ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী বহিরাগতদের মধ্যে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা নগণ্য, পক্ষান্তরে অধিকাংশ বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিবার পূর্বে নিজস্ব বাস্তুভিটা ও জমিজমা ছিল এবং এখনো অনেকের জায়গা জমি রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। তাহাদেরকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অথবা নানা প্রলোভনে বিভ্রান্ত ও সংগঠিত করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমানে স্ব-স্ব স্থানে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক যদি সরকার ও ইহার সশস্ত্র বাহিনী তাহাদেরকে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বাস্তব যে, তাহাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। তাহাদেরকে বাধা প্রদান না করিলে তাহারা স্ব-স্ব উদ্যোগে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম অথবা ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এসব বেআইনী বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র অবশ্যই পুনর্বাসন প্রদানকরণ সম্ভবপর। সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশন, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস, বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (NGO) সমূহের আর্থিক সহায়তায় এসব বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া সম্ভবপর। সেক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছা ও উদ্যোগই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবিলার নামে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী বেআইনী বহিরাগতদের সাহায্য ও পুনর্বাসন এবং শান্তকরণ নীতি, সেনা মৈত্রী প্রকল্প ইত্যাদি খাতে প্রতিদিন দেড় ইহতে দুই কোটি টাকা অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ৭২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে। সেক্ষেত্রে এসব ছিন্নমূল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র আর্থিক পুনর্বাসন প্রদান করা সহজে সম্ভবপর বলিয়া মনে করা যায়। অতএব, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের ও গুচ্ছ গ্রামের সেসব বেআইনী বহিরাগত বসবাস করিতেছে তাহাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া জুম্ম জনগণ তথা বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে একান্তই বাঞ্ছনীয় ও অপরিহার্য।৪

(২) ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল জুম্ম নরনারী ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ ১৯৬০ সালের পর উপজাতীয়দের মধ্য হইতে কে বা কাহারা ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বাংলাদেশ সরকারের নিকট এ ধরণের কোন তথ্য নাই। তবে ১৯৮৬ সালের পর যাহারা গিয়াছেন তাহাদের অবশ্যই ফিরিয়া আসার পর পূনর্বাসিত করা হইবে। যদি

তাহাদের জমি অন্যের অবৈধ দখলে থাকে তাহা মুক্ত করিয়া ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী নিজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় সফরকালে এ সম্পর্কে অত্যন্ত পরিস্কার বক্তব্য রাখিয়াছেন এবং নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের নিরাপত্তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য সুস্পষ্ট নহে। পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের হাজার হাজার নরনারী ১৯৬০ সালের পর প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় ইহা সর্বজনবিদিত। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে সুতরাং এতদবিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবিদিত থাকার কথা নয়। কেননা পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে হাজার হাজার বেআইনী বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অনত্র সরাইয়া না লওয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং জুম্ম শরণার্থীদের জীবনের নিরাপত্তা সহ সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা একান্তই অপরিহার্য।

(৩) কাপ্তাই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ করা এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের সুষ্ঠু পুনবার্সনের ব্যবস্থা করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ ১৯৬২ সনে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার সময়ই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ করা আছে। নতুন করিয়া নির্ধারণের কোন প্রশ্ন উঠে না। কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারবর্গকে সরকার পুনর্বাসন করিয়াছেন। তবে যদি কোন কারণে কোন পরিবার পুনর্বাসিত হয় নাই বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে সরকার তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

সমিতির মতামত ঃ কাপ্তাই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা এ যাবৎ যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয় নাই। প্রতি বৎসর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত বাঁধের জলসীমা নির্ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য যথার্থ নহে। তাই জলমগ্ন এলাকার জনগণের স্বার্থে কাপ্তাই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ ও ইহার ঘোষণা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় যাহাতে জুম্ম জনগণ জলেভাসা জমি ও পাহাড়ে যথাযথভাবে চাষাবাদ করিতে সক্ষম হয় এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে।

(৪) (ক) সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (BDR) ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

সরকারের বক্তব্য ঃ এ অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইয়া আসিলে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আবশ্যক সামরিক ক্যাম্পগুলো ব্যতীত অন্যান্য অস্থায়ী ক্যাম্পগুলি পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হইবে। তবে সেনানিবাসগুলি ও তাহাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে।

সমিতির মতামত ঃ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনানিবাস অথবা স্থায়ীভাবে সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও এসবের কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ সন্নিকটস্থ চট্টগ্রাম সেনানিবাসই ইহার জন্য যথেষ্ঠ। সুতরাং সেনাবাহিনীর সকল সেনানিবাস ও ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়।

(খ) বহিঃশত্রুর আক্রমণ যুদ্ধ বা কিংবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনাবাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনানিবাস স্থাপন না করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা যুদ্ধাবস্থা কিংবা জরুরী অবস্থা এবং প্রয়োজন ব্যতীরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটানো হইবে না। স্থাপিত সেনানিবাস যথাস্থানে থাকিবে এবং ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সেনানিবাস স্থাপন করা যাইবে।

সমিতির মতামত ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান করা হইলে এতদঞ্চলের স্থাপিত সেনানিবাস প্রত্যাহার করা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

সংশোধিত পাঁচদফা দাবীনামার ক্রমিক নম্বর ৪ (১) হইতে (৫)

৪। (১) (ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ ইতিপূর্বে সরকার কর্তৃক ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী অপরাপর প্রত্যাবাসী উপজাতীদের অনুরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সদস্যদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভবপর নহে। অতএব সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার চুক্তি সম্পাদনার সময়ে সমিতির সদস্যগণের সুষ্ঠু পুনর্বাসন প্রদানার্থে নতুন নীতিমালা নির্ধারণ করা অপরিহার্য।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকার মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া থাকে অথবা কাহারো অনুপস্থিতিতে যদি কোন বিচার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বিনাশর্তে সেইসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও উক্ত বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারো বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ ১৯৯৩ ইং সনের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছে। ইনসারজেন্সী সংক্রান্ত সকল মামলার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে। অমীমাংসিত

যথাযথ নহে। তাই মেধা ভিত্তিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর শিক্ষা লাভে অনেকেই বঞ্চিত হইতেছে।

(গ) সরকারী চাকুরীতে জুম্ম জনগণের জন্য বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য বয়ঃসীমা ইতিমধ্যেই তিন বৎসর বাড়ানো হইয়াছে যাহা উপজাতীয়দের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অধিকন্তু সাধারণ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ও বিচার ক্যাডারে প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের জন্য বয়সসীমা ৩২ বৎসর পর্যন্ত শিথিল করা হইয়াছে, প্রাথমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিকের স্থলে মাধ্যমিক করা হইয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ সরকারী চাকুরীতে জুম্ম জনগণের জন্য বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অধিকতর শিথিল করা বাঞ্ছনীয়।

(৩) (ক) সরকারী অনুদানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক স্থাপনে আগাইয়া আসিলে সরকার তাহার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টিকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করিবে।

সমিতির মতামত ঃ জুম্ম জনগণ অতিশয় দরিদ্র ও অনুন্নত। সুতরাং বেসরকারী পর্যায়ে কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব, সরকারী অনুদানে অথবা সরকারী ঋণে জুম্ম জনগণের জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা একান্তই অপরিহার্য।

(খ) ভূমিহীন ও জুম্ম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসনসহ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তজ্জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ সরকারী অর্থানুকূল্যে তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ সরকারী অর্থানুকূল্যে তিনটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়া থাকিলেও কার্যতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মধ্যে যাহারা ভূমিহীন ও জুম চাষী রহিয়াছে তাহাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনসহ কোন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইতেছে না। কারণ বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়ন খাতে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ও বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা কর্তৃক সাহায্যকৃত কোটি কোটি অর্থের সিংহভাগ বেআইনী বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আনয়ন ও পুনর্বাসন, সেনাবাহিনী চলাচল, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, সেনানিবাস ও সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন, সামরিক বাহিনীর ভরণ-পোষণ এবং তথাকথিত আইন-শৃংখলা রক্ষা ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সহ শান্তকরণ নীতি, সেনা মৈত্রী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি ইত্যাদিতে ব্যয় করা হইতেছে। তাই প্রকৃত পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি খাতের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের ফিরিস্তি দেওয়া হইলেও কার্যতঃ জুম্ম জনগণের স্বার্থে এযাবৎ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং

ভূমহীন ও জুম চাষীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনসহ জুম্ম জনগণের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দকরণসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ রাখা বাঞ্ছনীয়।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ রাংগামাটিতে ইতিমধ্যে একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য সঠিক নহে। কারণ রাংগামাটি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হয় নাই। রাঙ্গামাটিতে শুধু একটি সম্প্রসারণ কেন্দ্র (প্রেরণ কেন্দ্র) স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং জুম্ম জনগণের সংস্কৃতি সহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র অপরিহার্য।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বহাল রাখা এবং উহা পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা।

সরকারের বক্তব্য ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বহাল আছে। তবে বোর্ডকে অধিকতর কার্যকর করার ব্যাপারে কোন গঠনমূলক প্রস্তাব থাকিলে তাহা বিবেচনা করা হইবে।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য অস্পষ্ট। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আগামীতে বহাল রাখা হইবে কি হইবে না এবং ইহা আঞ্চলিক পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হইবে কিনা সেই সম্পর্কে সরকারের বক্তব্যে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড যদিও জুম্ম জনগণের সার্বিক উন্নয়নের নামে গঠিত হইয়াছে কিন্তু জুম্ম জনগণ ইহা হইতে আংশিক উপকৃত হইলেও মূখ্যতঃ সেনাবাহিনী ও বেআইনী বহিরাগতরাই উপকারের সিংহভাগ ভোগ করিতেছে। ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এই উন্নয়ন বোর্ড এ যাবৎ সামরিক বাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। তাই এই উন্নয়ন বোর্ডে চেয়াম্যান পদে বরাবরই ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসিকে বহাল রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য হইতে নিয়োগ করা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

সংশোধিত পাঁচদফা দাবীনামার ক্রমিক নম্বির ৫ (১) হইতে (৬)

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা একান্ত অপরিহার্য। তৎপরিপ্রেক্ষিতে -

(১) সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে আটককৃত সকল জুম্ম নর-নারীকে বিনা শর্তে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ এই প্রস্তাবটি ৪ (১)(খ) প্রস্তাবেরই পুনরুক্তি। সশস্ত্র বাহিনীর নিকট কেহ আটক নাই।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য যথাযথ নহে। কারণ অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে সরকার এ যাবৎ এ ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করে নাই।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে বেসামরিকীকরণ করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিক প্রশাসনই কার্যকর রহিয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ সশস্ত্র বাহিনীর হাজার হাজার সদস্য অদ্যাবধি পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র নিয়োজিত রহিয়াছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যাইতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি এখনো নিযুক্ত রহিয়াছেন। রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলার জেলা প্রশাসক, এসপি ও অন্যান্য কর্মকর্ত গণ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সেনা অধিনায়কগণের হুকুম ছাড়া কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন অনতিবিলম্বে বেসামরিকী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) জুম্ম জনগণকে গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম, শান্তিগ্রাম, যুক্তগ্রাম ও আদর্শ গ্রামের নামে গ্রুপিং করিবার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং এই গ্রাম সমূহ অনতিবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

সরকারের বক্তব্য ঃ প্রস্তাবটির অনুকূলে ইতিমধ্যে নীতিগত সিদ্ধন্ত ঘোষণা করা হইয়াছে এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

সমিতির মতামত ঃ জুম্ম জনগণকে বলপূর্বক স্বীয় ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদ করতঃ গুচ্ছগ্রামে গ্রুপিং করা হইয়াছিল। ফলতঃ জুম্ম জনগণ অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। এ সমস্ত গুচ্ছগ্রাম ভাংগিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলেও কার্যতঃ এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তেমন কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। অদ্যাবধি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে গুচ্ছগ্রাম সমূহ আগের মতই বলবৎ রহিয়াছে। সরকারের অর্থানুকূল্যে এ সব গুচ্ছগ্রামবাসীদের স্ব-স্ব ভিটামাটিতে পুনর্বাসন প্রদানে সরকার কর্তৃক কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না। যাহার ফলে গুচ্ছগ্রামবাসীরা স্ব-স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হইতেছে না। তদুপরি অনেক গুচ্ছগ্রাম ভাংগিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় সেনা অধিনায়কদের আপত্তি থাকায় ইচ্ছা সত্ত্বেও গুচ্ছগ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে স্ব-স্ব ভিটামাটিতে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া যে সমস্ত পরিবার গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পর ফলশ্রুতিতে ভিটাছাড়া হইয়া স্বদেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তু হইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে সে সব পরিবারদেরকেও সরকারী অর্থানুকূল্যে পূনর্বাসন প্রদান একান্তই অপরিহার্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য যথাযথ নহে। অথচ অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে এ বিষয়টা অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করা একান্তই বাস্তবসম্মত।

(৪) বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হইতে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর ও বেদখল বন্ধ করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ এই প্রস্তাবটি ২ (৫) গ ও ২ (৫) ঘ এর পুনঃরুক্তি।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য যথাযথ নহে। কেননা বেসরকারী পর্যায়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশের অপরাপর জেলা হইতে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ এবং সুকৌশলে ও

দুর্নীতির মাধ্যমে বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর ও বেদখল চলিতেছে। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে বসবাসরত বেআইনী বহিরাগতদেরকে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরকারী অর্থানুকূল্যে পূনর্বাসন দেওয়া হইতেছে। যে সমস্ত স্থানে এসব পূনর্বাসন দেওয়া হইতেছে ঐ সমস্ত পাহাড় অথবা জমি জুম্ম জনগণেরই দখলকৃত বা বন্দোবস্তকৃত জায়গা। অথচ আপাততঃ কোন প্রকারের পাহাড় ও জমি বন্দোবস্ত প্রদান বন্ধ - এই মর্মে সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষণা দেওয়ার কারণে জুম্ম জনগণ কোন প্রকারের পাহাড় ও জমিজমা বন্দোবস্ত গ্রহণে কার্যতঃ সক্ষম হইতেছে না। অতএব অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলার স্বার্থে বেসরকারী পর্যায়ে অনুপ্রবেশ, সুকৌশলে ও দুর্নীতির মাধ্যমে বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখলকরণ এবং পূনর্বাসন বন্ধ করা একান্তই অপরিহার্য।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত বহিরাগতদেরকে পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অনতিবিলম্বে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

সরকারের বক্তব্য ঃ এই প্রস্তাবটি ৫ (৩) প্রস্তাবেরই পুনঃরুক্তি।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য যথাযথ নহে। কারণ সরকারী পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধকরণের ঘোষণা দেওয়া হইলেও বেসরকারী পর্যায়ে অনবরত অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে। সে ক্ষেত্রে সরকারের তরফ হইতে কোন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না।

(৬) সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (BDR) ক্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য সামরিক, আধা- সামরিক বাহিনীর সেনানিবাস ও ক্যাম্প সমূহ পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

সরকারের বক্তব্য ঃ এই প্রস্তাবটি ৩ (৪) ক প্রস্তাবেরই পুনঃরুক্তি।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য যথার্থ নহে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিকভাবে সমাধানার্থে বর্তমান পর্যায়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হইতেছে। তাই এ পর্যায়ে অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে সেনানিবাস ও ক্যাম্প সমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে উভয়পক্ষে যুদ্ধবিরতি কালীন সময়েও সরকার এ যাবৎ ২৭টি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করিয়াছে যদিও ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক পুরাতন ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে।

অতএব সংশোধিত পাঁচদফা দাবীর উপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির উপরোক্ত মতামত সাপেক্ষে ইহা সুস্পষ্ট যে জুম্ম জনগণের

জাতীয় অস্তিত্ব, ভুমির স্বত্বাধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অগ্রগতির জন্য জনসংহতি সমিতির দাবী সমূহ পরিপূরণ ও বাস্তবায়ন একান্তই যুক্তিসংগত ও অপরিহার্য। "বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। সুতরাং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রদত্ত সংশোধিত পাঁচদফা দাবী সমূহ বিশেষতঃ শাসনতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক দাবীগুলো বাংলাদেশ সংবিধান পরিপন্থী ও রাষ্ট্রবিরোধী বিধায় গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান ও জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বীকৃতি সহ স্বায়ত্ব শাসন প্রদানের দাবী অবাস্তব ও অযৌক্তিক"- বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য কতিপয় মহলের এই বক্তব্য উপরোক্ত যুক্তি, ব্যাখ্যা ও মতামত সাপেক্ষে প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসংগত ও যথার্থ হইতে পারে না। সর্বোপরি বাংলাদেশ সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এককেন্দ্রীক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের সংবিধান ও শাসন ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিলে ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে - জনসংহতি সমিতির পেশকৃত সংশোধিত পাঁচদফা দাবী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্টের মৌলিক কোনরূপ পরিবর্তন আনায়ন না করিয়াও পেশকৃত দাবী সমূহ অনায়াসেই পরিপূরণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর। এই বক্তব্যের অনুকূলে নিম্নোক্ত বিষয়াদিও উত্থাপন করা যাইতে পারে-

১। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ (আট) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে -"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার - এই নীতিসমুহ তৎসহ এই নীতিসমুহ ইহতে উদ্ভুত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।"-অতএব রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহের ভিত্তিতে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে বাংলাদেশের অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণেরও রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে যেমনি পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে তেমনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বীয় ধর্ম ও বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমী ও চাক - ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণ গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকারী এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

অতএব রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহের ভিত্তিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট ও জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদাসহ জুম্ম পাহাড়ী জনগণের জাতীয় স্বীকৃতি ও স্বায়ত্ব - শাসন প্রদান করা যাইতে পারে।

২। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪ (চৌদ্দ) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে-"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে - কৃষক ও শ্রমিককে - এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকারের শোষণ হইতে মুক্তি প্রদান করা। প্রসংগত ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে অনেক অনগ্রসর অংশ রহিয়াছে। সুতরাং আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কেবলমাত্র অনগ্রসর এলাকা হিসাবে জুম্ম জনগণকে যে অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে তাহাতে অধিকতর পশ্চাদপদ

জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্বের স্বীকৃতি সহ পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করিয়া জুম্ম জনগণকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রদান করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং জুম্ম জনগণের সকল প্রকারের শোষণ হইতে মুক্তি প্রদানার্থে -

(ক) আলোচ্য অনুচ্ছেদ সংশোধন করিয়া অনুচ্ছেদের "কৃষক - শ্রমিককে" এই কথাগুলির পর "পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমি ও চাক - ভিন্ন ভাষাভাষী এই জুম্ম পাহাড়ী জাতিকে" অংশটুকু সংযোজন করা যাইতে পারে।

(খ) আলোচ্য অনুচ্ছেদে একটি উপ-অনুচ্ছেদ আনয়ন করতঃ-চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমি ও চাক - ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বীকৃতি প্রদান করতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করিয়া জুম্ম জাতির জন্য বিশেষ শাসন ব্যবস্থা আঞ্চলিক স্বায়ত্ব -শাসন প্রণয়ন করা যাইতে পারে।

৩। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে -"নারী বা শিশুদের অনুকূল কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না"। প্রসংগতঃ ইহা বাস্তব যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক অনগ্রসর অংশ থাকিলেও জুম্ম জনগণ সর্বাধিক পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর এবং স্বতন্ত্র জাতীয় ও শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের অগ্রগতির জন্য শুধুমাত্র "বিশেষ বিধান" প্রণয়নই যথেষ্ট হইতে পারে না। কারণ ইহাতে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমি স্বত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমি স্বত্ব ও মৌলিক অধিকার সমূহের নিরাপত্তা বিধানার্থে আলোচ্য অনুচ্ছেদে একটি স্বতন্ত্র উপ- অনুচ্ছেদ সংযোজন করতঃ নিম্নোক্ত শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থাদি সংবিধানে আনয়ন করা যাইতে পারে। স্বতন্ত্র উপ-অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ -

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি "বিশেষ শাসনবিধি" অনুযায়ী শাসিত হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র তফসিল (Schedule)সংবিধানে সংযোজিত থাকিবে।

(খ) গণ ভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন (Amendment) করা যাইবে না।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(ঘ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না।

(ঙ) আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সাংসদগণের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন বিষয় লইয়া কোন আইন অথবা বিধি প্রণয়ন করা যাইবে না।

৪। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৬ (ছয়ত্রিশ) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে - "জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে"। পার্বত্য চট্টগ্রমের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমি ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমি ও চাক - এই ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের স্বার্থ রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ প্রবেশ, চলাফেরা, বসবাস ও বসতি স্থাপনের বাধানিষেধ সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র উপ- অনুচ্ছেদ আলোচ্য অনুচ্ছেদে সংযোজন করা যাইতে পারে।

৫। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২ (১) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে - "আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না"। আলোচ্য অনুচ্ছেদ সংশোধন করিয়া অথবা এই অনুচ্ছেদে কোন স্বতন্ত্র উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমি ও চাক - এই ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ, ভূমি ও মৌলিক অধিকারের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ পাহাড়, ভূমি, বনাঞ্চল ও অন্যান্য সম্পত্তির উপর প্রয়োজনীয় বাধা নিষেধ আরোপের সাংবিধানিক আইন করা যাইতে পারে।

৬। বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৭ (সাতচল্লিশ) নম্বর অনুচ্ছেদে একটি স্বতন্ত্র উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমি ও চাক - ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের জাতিগত স্বীকৃতি সাংবিধানিকভাবে প্রদান করতঃ তাহাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা যাইতে পারে। তাই আলোচ্য অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত স্বতন্ত্র উপ-অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা যাইতে পারে - "পার্বত্য চট্টগ্রাম চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমি ও চাক - এই ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তা ও জুম্ম জনগণের অগ্রগতির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জুম্ম জাতীয় স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হইবে। তদুদ্দেশ্যে বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না"।

৭। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় যাহা হউক না কেন সেই দেশের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে পৃথক শাসন ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিদের জন্য স্বায়ত্ত শাসনের মর্যাদা প্রদান করা হইয়া আসিতেছে। যেমন -

(ক) এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় যুক্তরাজ্যের স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড ও ওয়েলস ইহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যা ৯.২ % স্কটল্যান্ডের স্থায়ী অধিবাসী আর যুক্তরাজ্যের মোট আয়তনের ৩২ % ভূখন্ড লইয়া স্কটল্যান্ড গঠিত। অথচ সেখানে স্কটিশদের জন্য একটি উন্নত পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাতে যুক্তরাজ্যের এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ঠ্যের উপর কোন প্রকারের অসংগতি অথবা সমস্যা সৃষ্টি হয় নাই। বরঞ্চ যুক্তরাজ্যের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একটি বিরাট অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, স্কটল্যান্ড ও স্কটিশদের স্বার্থ রক্ষার্থে স্কটল্যান্ডের ৭২ জন এমপি কমনস্ সভায় সুনির্দিষ্টভাবে নিজেদের ভূমিকা রাখিতে সক্ষম। স্কটল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী নামে আখ্যায়িত Secretary of State for Scotland (Scottish Secretary) ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। স্কটল্যান্ড বিষয়ক সকল বিল (Bill) বিভিন্ন স্কটিশ কমিটিগুলিতে যথাযথ বিশ্লেষণের পর অনুমোদিত হইয়া (প্রয়োজনে বিলগুলি সংশোধন করতঃ) চূড়ান্তভাবে গৃহীত করানোর উদ্দেশ্যে কমনস্ সভায় প্রেরিত হইয়া থাকে। এই পর্যায়ে স্কটল্যান্ডের ৭২ জন এমপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। এক কথায় স্কটল্যান্ডের ৭২ জন এমপি লইয়া গঠিত (Scottish Grand Committee) ছাড়াও Scottish Standing Committee) - এর সম্মতি ব্যতিরেকে স্কটল্যান্ড সম্পর্কিত কোন বিল কমনস সভায় গৃহীত হইবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

৯ (নয়) টি অঞ্চল, ৩ (তিন) টি দ্বীপ অঞ্চল ও ৫৩ টি জেলা লইয়া স্কটল্যান্ডের হস্তে বহুবিধ বিষয় হস্তান্তর করা হইয়াছে। তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হইতেছে - (১) স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য, আইন ও শৃংখ্বা (পুলিশ, অগ্নি নির্বাপক বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, জেলখানা ইত্যাদি); (২) শিক্ষাঃ স্কুল ও কলেজ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক মঞ্জুরী; (৩) উন্নয়ন কর্মকান্ড ঃ স্থানীয় সরকার, শহর ও গ্রামীন পরিকল্পনা, গৃহ নির্মাণ, রাস্তা ও যোগাযোগ; (৪) কৃষি, মৎস্য সম্পদ ভূমি বন্দোবস্ত (৫) পর্যটন; (৬) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, উত্তর সাগরের তৈল সম্পদ ইত্যাদি।

(খ) এছাড়া ইউরোপের ফিনল্যান্ড, ইতালী, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, জার্মানী ইত্যাদি রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু অধিবাসীদের (National Minorities) - কে জাতীয় স্বীকৃতি ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ইতালীর জার্মান-ভাষী দক্ষিণ টাইরল (South Tyrol) অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান করতঃ তাহাদেরকে অধিকতর স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হয়। ইহাতে ইতালীর পাচ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার জনসংখ্যার মধ্য হইতে কেবলমাত্র ৪,৩৩,২২৯ অর্থাৎ ০.৭৫ % (১৯৮১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী) জন অধ্যুষিত দক্ষিণ টাইরলবাসীদের জাতীয় স্বীকৃতি ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করা হইয়াছে। সর্বোপরি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ডেনমার্কের একাংশ হইতেছে গ্রীনল্যান্ড। এই গ্রীনল্যান্ডেও স্বায়ত্তশাসন

বলবৎ রহিয়াছে। গ্রীনল্যান্ডের স্থানীয় ইনুইট জনগোষ্ঠীকে স্বায়ত্তশাসন দিয়া আইন পাশ করিয়াছে।

(গ) ২২,৯০০ জন সুইডিশ-ভাষী ফিনিশ নাগরিক অধ্যুষিত এল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জেও (Alland Islands) ফিনল্যান্ড সরকার স্বায়ত্বশাসন প্রদান করিয়াছে। ফিনল্যান্ডের মোট জনসংখ্যা হইতেছে ৪৯,৭৫,০০০ জন। সুতরাং উক্ত সংখ্যালঘু অধিবাসীরা মোট জনসংখ্যার ০.৪৬ % অংশ মাত্র। অবশ্য সমগ্র ফিনল্যান্ডের সুইডিশ-ভাষী ফিনিশদের মোট জনসংখ্যার ২,৯৭,০০০ জন মাত্র অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সমগ্র জনসংখ্যার ৬ % মাত্র। ১৯৫২ সালে এই সুইডিশ-ভাষী ফিনিশ সংখ্যালঘু জাতিকে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয় তাহাতে উক্ত দ্বীপপুঞ্জের সমগ্র কর্তৃত্বই দেওয়া হইয়াছে বলা যায়। ২৭ সদস্য এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের হাতে দ্বীপপুঞ্জের নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে এবং এই পরিষদের চেয়ারম্যান ফিনল্যান্ড সরকারের সম্মতিতে গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। এই কার্যকরী পরিষদের হাতে ২১ (একুশ)টি বিষয় হস্তান্তর করা হইয়াছে। সেগুলি হইতেছে - আইন প্রণয়ন, পুলিশ, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, শিক্ষা, শিল্প কারখানা, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল, কৃষি, মৎস্য, কর আরোপ, বহিঃশুল্ক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে - এই দ্বীপবাসীদের নিজস্ব আবাসভূমি ও সুইডিশ বৈশিষ্ট্য চার উপায়ে সংরক্ষণ করা হইয়া থাকে। যথা - ভাষার উপর নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, আঞ্চলিক নাগরিকত্ব ও সম্পত্তি অর্জন। সুইডিশ ভাষাকে দ্বীপপুঞ্জের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। Alland Regional Citizenship ছাড়া কেহ এই দ্বীপভূমির নাগরিক হইতে পারে না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এলান্ড দ্বীপপুঞ্জের সংসদের সম্মতি ব্যতিরেকে ফিনল্যান্ড সরকার এই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার কোনরূপ সংশোধন কিংবা বর্জন করিতে সক্ষম নহে। এলান্ড দ্বীপপুঞ্জকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ ফিনল্যান্ডে একটি আইন ১৯৯১ সালে প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই আইনের আওতায় এলান্ড দ্বীপপুঞ্জ সরকার নিজস্ব পতাকা, ডাক, বেতার কেন্দ্র, সমাজ উন্নয়ন ও অন্যান্য কতিপয় বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

(ঘ) প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও জুম্ম জনগণের ন্যায় অনুন্নত, পশ্চাদপদ, দুর্বল ও সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আদিবাসীদের (Indigenous People's) জাতীয় সংহতি সহ স্ব-শাসনের সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন সংঘ শাসিত ইউনিয়ন টেরিটরি এবং রাজ্য সরকারের আওতাধীন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, উপজাতি অঞ্চল নামে বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসনের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে। অনুরূপ পাকিস্তানেও অনুন্নত, পশ্চাদপদ ও সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জাতীয় স্বীকৃতি সহ পৃথক শাসনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেমন খাইবার, কোরাম, মালাকান্দ ইত্যাদি এলাকায় উপজাতীয় অঞ্চল নামে পৃথক শাসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

দ্রষ্টব্যঃ ১লা অক্টোবর, রোজ শুক্রবার, ১৯৯৩ সন সংশোধিত পাঁচদফা দাবীনামার উপর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে জনসংহতি সমিতির মতামত যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের রূপরেখা

১। আঞ্চলিক পরিষদ গঠন -

(১)(ক) এই আঞ্চলিক পরিষদ "জুম্মল্যান্ড আঞ্চলিক পরিষদ" (Jummaland Regional Council) নামে অভিহিত হইবে।

(খ) পরিষদ অনধিক ৪৮ সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। তন্মধ্যে পরিষদের আসন নিম্নরূপ হইবে -

(১) কেবলমাত্র জুম্ম জনগণের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টি সাধারণ আসন থাকিবে।

(২) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ব্যতীত অন্যান্য সংখ্যালঘু জুম্ম জনগণের জন্য ৭ (সাত) টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) বাংঙালীদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

(৪) মহিলাদের জন্য ৩ (তিন)টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক আইনানুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(গ) মহিলা সদস্যগণ ব্যতিরেকে পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ একক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(২)(ক) পরিষদের একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল (Executive Council) থাকিবে। কার্যনির্বাহী কাউন্সিলে কতজন সদস্য থাকিবেন তাহা পরিষদের চেয়ারম্যানই স্থির করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে পরিষদের সকল সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের অধিক সদস্য কার্য নির্বাহী কাউন্সিলে থাকিবে না।

(খ) পরিষদের প্রধান চেয়ারম্যান নামে অভিহিত হইবেন। তিনি আইন প্রণয়ন ও কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করিবেন।

(৩) নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে যে দল বা যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিবেন সেই দল বা তাহারা কার্যনির্বাহী কাউন্সিল গঠন করিবেন।

(৪) পরিষদে একজন অধ্যক্ষ (স্পীকার) ও একজন উপ-অধ্যক্ষ (ডেপুটি স্পীকার) থাকিবেন।

(৫) পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে এই মেয়াদ কার্যকরী হইবে।

(৬) (ক) পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সংখ্যক নির্বাচনী এলাকায় এমনভাবে বিভক্ত করা যাহাতে নির্বাচনী এলাকার জনসংখ্যা অনুপাতের সামঞ্জস্যতা থাকে।

(খ) পরিষদের সংরক্ষিত আসনসমূহের নির্বাচনী এলাকা এমনভাবে বিভক্ত করিতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের সংখ্যাধিক্য থাকে।

(৭) নির্বাচনের পর পরিষদের প্রথম বৈঠকে পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে পরিষদ একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপ-অধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন।

(৮) পরিষদের প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকিবেন।

পরিষদের সদস্যগণের যোগ্যতা - অযোগ্যতা -

(১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী হইলে, তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এবং ২ (২) বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান।

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন।

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন।

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কমপক্ষে দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া না থাকে।

(ঙ) তাহার কোন ব্যাংকে গৃহীত ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ অবস্থায় তিনি অনাদায়ী থাকেন।

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

৩। চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ, নির্বাহী কাউন্সিল ও সাধারণ পরিষদ সদস্যগণের শপথ -

(১) চেয়ারম্যান তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ গ্রহন করিবেন এবং শপথনামা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(২) অধ্যক্ষ ও উপ -অধ্যক্ষ তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথনামা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৩) (৩) কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ তাহাদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথনামা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৪) পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ তাহাদের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত ফরমে পরিষদ অধ্যক্ষ কর্তৃক শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথনামা পত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

৪। পদ মর্যাদা -

চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য ও পরিষদের সদস্যগণের পদ মর্যাদা নিম্নরূপ হইবে -

(১) চেয়ারম্যান --- মন্ত্রী পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি
(২) অধ্যক্ষ --- প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি
(৩) উপ-অধ্যক্ষ --- প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি
(৪) কার্যনির্বাহী সদস্য --- উপমন্ত্রী পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি
(৫) পরিষদের সদস্য --- সচিব পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি

৫। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা -

চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ ও পরিষদের প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার ও তাহার পরিবারের যে কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর - অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন। এখানে পরিবারের সদস্য বলিতে স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার সাথে বসবাসকারী ও তাহার উপর নির্ভরশীল ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নি বুঝাইবে।

৬। চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ ও পরিষদ সদস্যের পদ শূন্য হওয়া-

(১) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইবে যদি -

(ক) তিনি সরকারী গেজেটে তাহার নাম প্রকাশিত তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে শপথ গ্রহণে ব্যর্থ হন। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করা যাইবে।
(খ) তিনি ২ (দুই) ধারার অধীনে তাহার পদে থাকিবার অযোগ্য হইয়া যান
(গ) তিনি পদত্যাগ করেন।
(ঘ) তিনি পরিষদের সদস্য না থাকেন।
(ঙ) তিনি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারান।
(চ) পরিষদ ভাংগিয়া যায়।
(ছ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) অধ্যক্ষ ও উপ-অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইবে যদি -

(ক) তিনি পরিষদ সদস্য না থাকেন।
(খ) পদ হইতে তাহার অপসারণ দাবী করিয়া মোট পরিষদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব পরিষদে গৃহীত হয়।
(গ) তিনি পদত্যাগ করেন।

(ঘ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(ঙ) উপ-অধ্যক্ষের ক্ষেত্রে তিনি অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন,

(৩) কোন সদস্যের সদস্য পদ শূন্য হইবে যদি -

(ক) তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহণ না করেন।

(খ) তিনি ২ (দুই) ধারার অধীনে তাহার পদে থাকিবার অযোগ্য হইয়া যান।

(গ) তিনি পদত্যাগ করেন।

(ঘ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(ঙ) তিনি পরিষদের সদস্য না থাকেন।

(চ) পরিষদের অনুমতি না লইয়া একাদিক্রমে ৬০ (ষাট) দিন অনুপস্থিত থাকেন।

(৪) চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকিলে কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। তবে তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাহারা স্ব-স্ব পদে বহাল থাকিতে পারিবেন।

৭। চেয়ারম্যান পদ, অধ্যক্ষ পদ, উপ-অধ্যক্ষ পদ ও সদস্য পদ পূরণ করা -

(১) চেয়ারম্যান পদ শূন্য হইলে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করিবেন। তাহা সম্ভব না হইলে পরিষদ ভাংগিয়া যাইবে।

(২) (ক) অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে বা কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উপ-অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হইবেন।

(খ) উপ-অধ্যক্ষ পদ শূন্য হইলে বা কোন কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে পরিষদের সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে উপ-অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করিবেন।

(৩) কোন সদস্য পদ শূন্য হইলে তা পূরণের জন্য সদস্যপদ শূন্য হইবার দিন হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আইন ও বিধি মোতাবেক উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা যাইবে।

৮। পরিষদের সাধারণ নির্বাচন -

(১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) (ক) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার পরিষদ সদস্য হইবেন না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে তিনি কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক তাহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরিত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন সেই সকল এলাকার আসন শূন্য হইবে।

(গ) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার আগে পরিষদ ভাংগিয়া গেলে উক্ত দিন হইতে ৯০ নব্বই দিনের মধ্যে পুনরায় পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(ঘ) (১) জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত, ভোটার তালিকার সেই অংশ পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ও উপ-নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে।

(২) প্রয়োজনে ভোটার তালিকা নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইবে।

(৩) পরিষদের সাধারণ ও উপ-নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্বাচন কমিশন পরিষদের পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করিবেন।

(ঙ) পরিষদ ভাংঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কারণে পরিষদের কোন সদস্য পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিবার জন্য উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৯। নির্বাচন পরিচালনা -

(১) সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন এই আইন ও বিধি অনুযায়ী পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ও উপ-নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

(২) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হইবে এবং আপাততঃ বলবৎ নির্বাচন কমিশনের বিধান অনুসারে তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারিত হইবে।

(৩) পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেট প্রকাশ করিবেন।

১০। পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধি ও কোরাম -

(১) পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী -বিধি দ্বারা পরিষদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন।

(৩) পরিষদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ১২ (বার) এর কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহা হইলে তিনি অন্যূন ১২ (বার) সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মূলতবি করিবেন।

১১। কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের ক্ষমতা -

(১) সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের থাকিবে।

(২) পরিষদের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা আইন,বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন সদস্যের মাধ্যমে তাহা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) কার্যনির্বাহী কাউন্সিল যৌথভাবে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে।

১২। পরিষদের সভা ও কার্যাবলী নিষ্পন্ন -

(১) (ক) প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৩ (তিন) বার পরিষদের অধিবেশন বসিবে।

(খ) পরিষদের অধ্যক্ষ ও তাহার অনুপস্থিতিতে উপ-অধ্যক্ষ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও পরিচালনা করিবেন।

(গ) পরিষদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ১২০ দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না।

(২) পরিষদের কার্যাবলী বিধি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটি সমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।

১৩। কমিটি গঠন -

(১) পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজন বোধে কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও উহার দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কমিটিতে উহার সংশ্লিষ্ট যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

১৪। পরিষদ ভাংগিয়া যাওয়া -

(১) নির্বাচনের ফল ঘোষিত হইবার প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত হইলে পরিষদ ভাংগিয়া যাইবে।

(২) পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে পরিষদের চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিবেন কিংবা পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর নিকট পরামর্শ প্রদান করিবেন। সে ক্ষেত্রে অন্য কোন পরিষদ সদস্য পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে মন্ত্রী সন্তুষ্ট হইলে পরিষদ ভাংগিয়া দিবেন।

(৩) পরিষদের চেয়ারম্যানের উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ স্বীয় পদে বহাল থাকিতে পারিবেন।

১৫। চুক্তি ও দলিল -

(১) কার্যনির্বাহী কাউন্সিল কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে।

(২) কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য চেয়ারম্যান কিংবা কোন সদস্য কিংবা কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না।

(৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কাউন্সিল কাজ করিবে।

১৬। নির্মাণ কাজ -

পরিষদ প্রবিধান দ্বারা সম্পাদিতব্য সকল প্রকারের নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা ও আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবসহ উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ও কি শর্তে অনুমোদিত হইবে প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রণয়ন করিবার বিধান করিবে।

১৭। নথি পত্র -

পরিষদ উহার কার্যাবলীর নথিপত্র ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন, প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে।

১৮। পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ -

(১) পরিষদের প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনা ও পরিচালনার জন্য পরিষদ মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদ সৃষ্টি করিবেন।

(২) (ক) পরিষদে সচিব সমতুল্য পদের একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন। তিনি অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ও জুম্ম জাতীয় হইবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে পরিষদ তাহার নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(খ)(১) পরিষদ বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন।

(২) যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সরকার হইতে প্রেষণে (Deputation) বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা পরিষদ নিয়োগ করিবেন।

(গ) পরিষদ নিয়ম বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিবেন।

(৩) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা উহার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি যেমন - যোগ্যতা, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, শাস্তি, শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল, বদলী, তদন্ত পদ্ধতি, বরখাস্ত, অপসারণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে।

১৯। পরিষদের তহবিল -

(১) "আঞ্চলিক পরিষদ তহবিল" নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে -

(ক) পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ।

(খ) সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান ও মঞ্জুরী।

(গ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস, শুল্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য দাবীবাবদ প্রাপ্ত অর্থ।

(ঘ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা।

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা।

(চ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(ছ) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত রয়্যালটি।

(জ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ।

(৩) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারী কিংবা সরকারী ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে রাখা হইবে।

(৪) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলে একটি অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথক তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

(৬) পরিষদের তহবিলের অর্থ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন ও কর্তব্য পালনে ব্যয়, পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা যাইবে।

২০। ভবিষ্যৎ তহবিল -

(১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী বদান্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং কর্মচারীদেরকে গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

২১। পরিষদের তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ ও পরীক্ষা -

(১) পরিষদের তহবিলের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করা যাইবে।

(২) পরিষদের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

২২। পরিষদের সম্পত্তি -

(১)পরিষদের মালিকানাধীন যাবতীয় সম্পত্তি বা উহার উপর ন্যস্ত সম্পত্তি প্রবিধান দ্বারা ব্যবস্থাপনা, হস্তান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে।

(২) দান,বন্ধক, বিক্রয়, ইজারা বা বিনিয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

২৩। উন্নয়ন পরিকল্পনা -

পরিষদ উহার এখতিয়ারভূক্ত যেকোন বিষয়ে পরিষদের তহবিলের সংগতি অনুযায়ী ও সম্ভাব্য আয় বুঝিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তত বাস্তবায়িত করিতে পারিবে।

২৪। বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন -

(১) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উহার তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সংগতি রাখিয়া উক্ত বৎসরের বাজেট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে।

(২) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথমবার যে অর্থ বৎসরের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ বৎসরটির অবশিষ্ট সময়ের জন্য কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত হইবে।

২৫। পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর -

(১) কোন প্রকারের আয়কর আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) পরিষদ কর্তৃক বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল, ফিস, শুল্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের সকল প্রকারের কর, রেইট, টোল, ফিস, শুল্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করা যাইবে।

(৪) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল, ফিস, শুল্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে।

(৫) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল, ফিস, শুল্ক, রয়্যালটি ও অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য ও নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

২৬। পরিষদ কর্তৃক বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা -

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ উহার তালিকাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এই রূপ বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, উপআইন, নিয়ম ও আদেশ ইত্যাদি প্রণয়ন, জারী ও কার্যকর করিবার ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক প্রণিত সকল বিধি, প্রবিধান, উপ-বিধি, উপ-আইন, নিয়ম, আদেশ ইত্যাদি সরকারী গেজেট বিনাবিলম্বে প্রকাশিত হইবে এবং এইরূপে প্রকাশিত হইলে উহারা কার্যকরী হইবে।

২৭। পুলিশ -

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনী গঠন করা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশের ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য পরিষদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বদলি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের চাকুরীর শর্তাবলী,- তাহাদের প্রশিক্ষণ, সাজ-সজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাহাদের পরিচালনা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

২৮। ভূমি হস্তান্তরের বাধা নিষেধ -

(১) পরিষদের এলাকাধীন পাহাড় ও সকল প্রকারের জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট পাহাড় ও কোন প্রকারের জমি দান, হস্তান্তর, বিক্রি বা বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না।

(৩) পরিষদের এলাকাধীন কোন পাহাড়, বনাঞ্চল ও কোন প্রকারের জমি পরিষদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত বা অধিগ্রহণ করা যাইবে না।

২৯। বিচার ও বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত -

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংঙ্গালি ব্যতিরেকে ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীসমুহের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। তদুদ্দেশ্যে -

(ক) গ্রাম আদালত

(খ) ইউনিয়ন আদালত

(গ) জেলা আদালত

(ঘ) পরিষদীয় আদালত স্থাপন করা এবং এই সব আদালতের জন্য পরিযদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন ও কার্যবিধি প্রণয়ন করা।

(২) জুম্ম জনগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, সামাজিক রীতি- নীতি, প্রথা ইত্যাদি জুম্ম জাতীয় ক্ষেত্রে কোন মামলা মোকদ্দমা উদ্ভব হইলে উক্ত মামলা মোকদ্দমাসহ অন্যান্য সকল দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমা পরিষদের আওতাধীন আদালতে বিচার নিষ্পন্ন হইবে।

(৩) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়ের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন আদালতে, ইউনিয়ন আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়ের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে এবং জেলা আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়ের বিরুদ্ধে পরিষদীয় আদালতে আপীল করা যাইবে।

(৪) পরিষদীয় আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যাইবে এবং হাইকোর্টের রায় চূড়ান্ত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে যদি সংশ্লিষ্ট বিরোধ বা মামলা জুম্ম জাতীয় বিষয়ক হইয়া থাকে তাহা হইলে আপীল নিষ্পত্তির পূর্বেই হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট জাতি হইতে অন্যূন তিনজন বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

(৫) ২৯ (২) - তে বর্ণিত বিষয় ভিত্তিতে জুম্ম নহে এমন কোন ব্যক্তির সাথে কোন বিরোধ বা মামলা দেখা দিলে সেই বিরোধ বা মামলা পরিষদ আওতাধীন আদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে উক্ত বিরোধ বা মামলা পরিষদের আওতাধীন কোন আদালতে নিষ্পত্তি করা হইবে তাহা পরিষদ নির্ধারণ করিবেন।

(৬) রাষ্ট্রে বলবৎ আইন ও দণ্ডবিধি অনুসারে সকল প্রকারের ফৌজদারী মামলা ও মোকদ্দমা রাষ্ট্রে বিদ্যমান আদালতসমূহ কর্তৃক বিচার নিষ্পন্ন হইবে।

(৭) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিরোধ বা মামলা নিষ্পত্তির জন্য

(ক) বিচার পদ্ধতি

(খ) নিয়ম বিধি

(গ) বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস নির্ধারণ করিবে।

৩০। পরিষদের কার্যাবলী -

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে -

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা

(২) জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

(৩) (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ বাহিনী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

(খ) পুলিশের ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য পরিষদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়োজিত হইবেন। পরিষদ তাহাদের বদলী, পদোন্নতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করিবেন।

(গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের চাকুরীর শর্তাবলী, প্রশিক্ষণ, সাজ-সজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পরিচালনা বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর অনুরূপ হইবে।

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) ভূমি -

(ক) ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও বন্দোবস্ত এবং দলিল পত্র রেজিষ্ট্রেশন।

(খ) পরিষদের আওতাধীন পাহাড় ও সকল শ্রেণীর ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয়, বন্দোবস্ত ও যে কোন প্রকারের হস্তান্তর বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।

(গ)ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

(৫) শিক্ষা -

(ক) কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ।

(খ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকরণ।

(গ) ছাত্র বৃত্তি, ছাত্রাবাস, বিদ্যালয় স্থাপন, বয়স্ক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সাধারণ পাঠাগার।

(৬) কৃষি, কৃষি ও উদ্যান উন্নয়ন।

(৭) (ক) বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

(খ) সংরক্ষিত (Reserved) বনসহ অন্যান্য সকল শ্রেণীর বন সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।

(৮) গণস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং হাসপাতাল, ডিসপেনসারী ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(৯) পশু পালন ও উন্নয়ন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

(১০) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১১) (ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(খ) স্থানীয় শিল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১২) (ক) ব্যবসা বানিজ্য।

(খ) বাজার দর নিয়ন্ত্রণ।

(গ) স্থানীয় শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাতকরণ।

(ঘ) স্থানীয় ভিত্তিক বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(১৩) রাস্তাঘাট, খেয়াঘাট, পুল ও অন্যান্য যাতায়াত ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

(১৪) যোগযোগ ও পরিবহণ।

(১৫) পর্যটন।

(১৬) সমবায় উন্নয়ন ও জনপ্রিয়করণ।

(১৭) হাট-বাজার ও মেলা স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১৮) সংস্কৃতি -

(ক) সাধারণ ও জুম্ম সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠন।

(খ) জুম্ম জনগণের ভাষা, সাহিত্য, অভ্যাস ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন।

(গ) যাত্রা, প্রমোদানুষ্ঠান, প্রদর্শনী, জাতীয় দিবস ও অন্যান্য উৎসব উদযাপন, তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও সংরক্ষণ, লাইব্রেরী স্থাপন, স্বাস্থ্য,শিক্ষা, কৃষি, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য প্রচার, যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন, শরীরচর্চাসহ সংস্কৃতিমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) উদ্যান ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(১৯) পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ।

(২০) (ক) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা।

(খ) জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।

(২১) গোরস্থান ও শ্মশান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(২২) আইন ও বিচার-

(ক) পরিষদ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

(খ) দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমা পরিষদের আওতাধীন আদালত কর্তৃক বিচার নিষ্পন্ন করা হইবে।

(গ) ফৌজদারী মামলা মোকদ্দমা রাষ্ট্রে বিদ্যমান আদালতসমূহ কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।

(২৩) কর সংক্রান্ত -

(ক) ভূমি রাজস্ব ধার্য ও আদায়করণ।

(খ) স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন ও প্রস্তুতজাত নিম্নোক্ত দ্রব্যাদির উপর আবগারী শুল্ক ধার্য ও আদায়করণ -

(১) ব্যবসার উদ্দেশে প্রস্তুত মদ্য।

(২) আফিং, গাঁজা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য।

(গ) নিম্নোক্ত ক্ষেত্র হইতে পরিষদ কর্তৃক কর, টোল,ফিস,শুল্ক, রয়্যালটি আরোপ ও আদায়করণ -

(১) ভূমি ও দালান কোঠা;

(২) কোন বাজারে বিক্রয়ার্থে প্রবেশের জন্য ভোগ ও ব্যবহারের জন্য দ্রব্যাদির উপর;

(৩) পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর;

(৪) যানবাহনের উপর;

(৫) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর;

(৬) রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল;

(৭) বিজ্ঞাপনের উপর;

(৮) পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস;

(৯) জন কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট;

(১০) পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস;

(১১) বৃত্তি, পেশা ও ব্যবসার উপর;

(১২) বিলাস দ্রব্য ও লটারী;

(১৩) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর;

(১৪) বনজ সম্পদের উপর;

(১৫) মামলা মোকদ্দমার ফিস;

(১৬) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর;

(১৭) খনিজ সমূহের অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ হইতে প্রাপ্ত রয়্যালটি অংশ বিশেষ;

(১৮) পরিষদ কর্তৃক জন কল্যাণমূলক কাজ হইতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস;

(১৯) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর প্রমোদ কর।

(২৪) (ক) সমাজ কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন।

(খ) গ্রাম উন্নয়ন ও গণ সংযোগ।

(২৫) অর্থ সংক্রান্ত লেন-দেন।

(২৬) যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া -

(ক) যুব সমাজের উন্নয়ন;

(খ) ক্রীড়া ও খেলাধূলার উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতা।

(২৭) ডাকবাংলা, সরাইখানা, কমিউনিটি সেন্টার, পাবলিক হল, বিশ্রামাগার, জনসভার স্থান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(২৮) দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(২৯) মহাজনী কারবার ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ।

(৩০) জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসন।

(৩১) ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদ চোলাই, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ।

(৩২) নদী-নালা, খাল-বিল ও কাপ্তাই হ্রদের জল সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা।

(৩৩) পরিবেশ সংক্রান্ত।

(ক) পরিষদের সদস্যগণের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি;

(খ) পরিষদের চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপ-অধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি;

(গ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি;

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি।

(৩৪) কারাগার নিয়ন্ত্রণ।

৩১। পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য মামলা পদ্ধতিগতভাবে দায়ের করা যাইবে।

জেলা পরিষদ

১। (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করিয়া জেলা পরিষদ থাকিবে।

(২) জেলা পরিষদ অনধিক ২৪ সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। আঞ্চলিক পরিষদের আসনসমুহ যেভাবে নির্ধারণ করা হইবে উহার সহিত সংগতি রাখিয়া ও তিনটি জেলার ভিন্ন ভাষা-ভাষী জুম্ম জনগণের বসবাসের বৈশিষ্ট বিচার করিয়া পরিষদ গঠিত হওয়ার পর জেলা পরিষদের আসনসমুহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পরিষদ কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকিবে। তাহারা অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(৪) জেলা পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলাকে ২১ সংখ্যক নির্বাচনী এলাকায় এমনভাবে বিভক্ত করা যাহাতে যথাসম্ভব নির্বাচনী এলাকার জনসংখ্যা অনুপাতের সামঞ্জস্য থাকে এবং সংরক্ষিত আসন সমূহের (যদি সংরক্ষিত থাকে) নির্বাচনী এলাকা এমনভাবে বিভক্ত করা যাহাতে সংশ্লিষ্ট জাতি সমুহের সংখ্যাধিক্য থাকে।

(৫) জেলা পরিষদের সদস্যগণ একক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

(৬) জেলা পরিষদের মেয়াদ ৫ বৎসর হইবে।

(৭) নির্বাচন কমিশন আইন ও বিধি অনুযায়ী জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ও উপ-নির্বাচন পরিচালনা করিবেন। জেলা পরিষদের সদস্য হিসাবে সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

(৮) জেলা পরিষদের প্রধান চেয়ারম্যান নামে অভিহিত হইবেন। তিনি জেলা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(৯) জেলা পরিষদের সদস্যগণের যোগ্যতা সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিষদের সদস্যগণের অনুরূপ হইবে।

(১০) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের সভা আহবান ও পরিচালনা করিবেন।

(১১) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদ মর্যাদা নিম্নরূপ হইবে

(ক) চেয়ারম্যান - উপমন্ত্রী পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি

(খ) সদস্য - উপসচিব পদ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাদি

(১২) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি কর্তৃক শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথ নামায় স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

২। পরিষদ কর্তৃক বিধি দ্বারা জেলা পরিষদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৩। জেলা পরিষদের একটি কার্যালয় থাকিবে। এই কার্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের দায়দায়িত্ব সম্পাদনার্থে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা এইসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারিত হইবে।

৪। জেলা পরিষদ পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত কার্যাবলী ও তৎপ্রেক্ষিতে পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসহ সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য সকল বিষয় ও আদেশ কার্যকর করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

৫। জেলা পরিষদ উহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে।

ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদের গঠন, নির্বাচন, দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা, মেয়াদ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পৌরসভা

পৌরসভার গঠন, নির্বাচন, দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা মেয়াদ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ৪ঠা ডিসেম্বর, রোজ শুক্রবার, ১৯৯২ সন পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক সংশোধিত পাঁচদফা দাবীনামাসহ আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক [illegible] [illegible] সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পেশ করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক,খ,গ,ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন ঃ

(ক) সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এ চুক্তির আওতায় যথাশিগ্‌গির ইহার বিভিন্ন ধারায় নিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে;

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ঃ আহ্বাহক

(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান ঃ সদস্য

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ঃ সদস্য

৪। এই চুক্তির উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

(খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং-এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। (ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্যে ৩ (তিন)টি আসন থাকিবে। এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্যে হইবে।

(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

(গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলির প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে "কোন ব্যক্তি 'অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্যে প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"-এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করিবেন-অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বৎসর' শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর." শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"-এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবন জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারির পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবেঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

(খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্যে, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১, ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। (ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপধারাটি প্রণয়ন করা হইবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন. পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনারের (ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ পরিষদে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। (ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ" এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্যে আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্যে সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। (ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

(খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবেঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হইবেঃ

(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
(খ) পুলিশ (স্থানীয়);
(গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;
(ঘ) যুব কল্যাণ;
(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
(চ) স্থানীয় পর্যটন;
(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
(জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
(ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;
(ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
(ট) মহাজনী কারবার;
(ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস-এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

(ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;
(খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;
(গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;
(ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;
(ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;
(চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;
(ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালিটির অংশ বিশেষ;
(জ) সিনো, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;
(ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;
(ঞ) ব্যবসার উপর কর;
(ট) লটারীর উপর কর;
(ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন)-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতি পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি থেকে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও'দের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অর্ন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋন ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নেবর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ '৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা

বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলে ভাসা জমি)-এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;

ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বছর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আসন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষন ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্যে সরকারী চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্যে সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী, পরোয়ানা, হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব-স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্যে সহজশর্তে ব্যাংক ঋন গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ

৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি

৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি

৮) সাংসদ, বান্দরবন

৯) চাকমা রাজা

১০) বোমাং রাজা

১১) মং রাজা

১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)
আহবায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিদের পক্ষে
(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

৪ জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবীনামা এবং স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা

জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাক্‌মা

স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির আপত্তির কথা এই পুস্তিকায় প্রসংগান্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির কাছে অর্পিত দায়িত্ব এবং ক্ষমতা জনসংহতি সমিতির পাঁচদফা দাবীর নূন্যতম কয়টি এবং কি দাবী পূরণ হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(১) ১৯৮৭ সালের ১৭ই ও ১৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে জনসংহতি সমিতি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলের কাছে যে পাঁচদফা দাবী পেশ করে, তার প্রথম এবং প্রধান দাবী ছিলো পার্বত্য চট্টগামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান পূর্বক তথা স্বায়ত্তশাসন প্রদান। জনসংহতি সমিতি ১৯৮৮ সালের ১৯ই জুন অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠক পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে অটল থাকে। ১৯৮৮ সালে ১৪ই এবং ১৫ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি পাঁচদফা দাবীনামা সংশোধন করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্বলিত দাবীনামা পেশ করে। জনসংহতি সমিতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে রূপান্তরিত করলেও মূল পাঁচদফা দাবীনামার অপরাপর সমূদয় দাবী অপরিবর্তিত রাখে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আলোচক দল ও পার্বত্য চট্টগাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির কাছে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবী জানিয়েছিল। কি কারণে সে দাবী শেষ পর্যন্ত অর্জিত হয়নি তাও এই পুস্তিকায় প্রসংগান্তরে আলোচনা করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতি পার্বত্য অঞ্চল তথা "জুম্মলান্ড" গড়ে তুলতে চায়। তাই কোন কোন ক্ষুদ্র উপজাতির মতে অখন্ড পার্বত্য অঞ্চল মানেই এক বা একাধিক উপজাতির অন্যানা উপজাতিগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার। এই এক বা একাধিক উপজাতির আধিপত্য বিস্তারের আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী অর্জনেরও অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। তাই

জনসংহতি সমিতি চাইলেই যে, সকল উপজাতিকে ঐকবদ্ধ রাখা যাবে এমন তা বিশ্বাস করা যায় না।

(২) পাঁচদফা দাবীনামায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সংযোজন করা হলেও মূল পাঁচদফা দাবীনামায় যে সকল বিষয় প্রাদেশিক পরিষদের কাছে হস্তান্তরের দাবী করা হয়েছিল আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষেতেও ঐ সকল বিষয় হস্তান্তরের দাবী অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বেতার টেলিভিশন, ডাক, বিচার ববস্থা, খনিজ সম্পদ, পর্যটন, তথ্য (সংবাদপত্র) বিদুৎ সরবরাহ ও সীমান্ত রক্ষা ব্যতীত জনসংহতি সমিতির পাঁচদফা দাবীনামায় সংযোজিত অন্যান্য সব বিষয় স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহে রাখা হয়েছে। এ প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসীলে স্বায়ত্তশাসিত জেলার মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসীল অনুসারে আঞ্চলিক পরিষদ স্বায়ত্ত্বশাসিত জেলা পরিষদের নীচের স্তরের একটা প্রশাসনিক সংস্থা। সেদিক থেকে বিচার করলে জেলা পরিষদের নিম্নস্তরের একটা প্রশাসনিক সংস্থার কাছে হস্তান্তরের জন্য জনসংহতি সমিতির দাবীনামায় তালিকাভুক্ত উপরোক্ত কতিপয় বিষয় হস্তান্তরের দাবী অবান্তর।

(৩) পার্বত্য অঞ্চলকে "জুম্মলান্ড" ঘোষণার দাবী একটা বিতর্কিত বিষয়। জীবিকা বা পেশা ভিত্তিতে কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগোষ্ঠির নাম নির্ধারিত হতে পারেনা। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠি এককালে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে তারা "জুমিয়া"। কিন্তু "জুম্ম্যা বা "জুম্ম" নয়। এটা পার্শ্ববর্তী চট্টগাম জেলার অধিবাসীগণ কর্তৃক প্রদত্ত নাম যার অর্থ অর্ধসভা এবং অনুন্নত জনগোষ্ঠি। সুতরাং এটা কিছুতেই উপজাতীয় জনগোষ্ঠির জাতীয় পরিচয় হতে পারেনা। জনসংহতি সমিতি চাইলে সব উপজাতি "জুম্ম জাতি" হিসাবে পরিচিত হতে চাইবে না।

(৪) জনসংহতি সমিতির অন্যতম প্রধান দাবী হল অন্য জেলার লোক পার্বত্য অঞ্চলে বসতিস্থাপন করার বিষয়ে সংবিধানে বিধিনিষেধ আরোপ করা। এই দাবী সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি হলেও কোন একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং তাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য এ ধরণের বিধিনিষেধ পৃথিবীর কোন কোন দেশে রাখা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে জমি বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে বিশেষতঃ এই অঞ্চলের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তিদের কাছে জমি বন্দোবস্ত প্রদান বা এমন ব্যক্তি কর্তৃক জমি খরিদের ক্ষেত্রে সে ধরণের বিধিনিষেধ স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে আরোপ করা হয়েছে। তাতে বাইরের কোন লোকের পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলে জমির মালিকানা লাভ বেশ কঠিন করা হয়েছে। এতে পাবর্তা অঞ্চলের বাইরের কোন লোকের পক্ষে এখানে জমির মালিকানা লাভ করা কঠিন হবে।

(৫) পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা নন এমন ব্যক্তি যাতে এই অঞ্চলের চাকুরীর কোন সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে, তজ্জন্য সাংবিধানিকভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করাও জনসংহতি সমিতির অন্যতম দাবী। স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে অত্র অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন উপজাতির এবং সম্প্রদায়ের জনসংখানুপাতে কর্মচারী নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।

(৬) ১৯৪৭ সালের ৭ই আগষ্টের পর অন্য জেলার যে সকল লোক পার্বত্য চট্টগাম শাসনবিধি লংঘন করে পার্বত্য অঞ্চলে জায়গা-জমির মালিকানা লাভ করেছে তাদেরকে এই অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য জনসংহতি সমিতি দাবী জানিয়েছেন। এই পুস্তিকায় প্রসংগান্তরে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(৭) জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সমঝোতা হয়নি। তাই মামলা জড়িত বা সাজা প্রাপ্ত জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর কোন সদস্যকে মুক্তি দেওয়া বা সাজা মওকুফ করার প্রয়োজন হয়নি।

(৮) পার্বত্য অঞ্চলের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড সরাসরি সম্পাদন এবং অন্যান্য সরকারী এবং আধাসরকারী সংস্থা কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদগুলির কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির এতদ বিষয়ক দাবী সম্পূর্ণ না হলেও বহুলাংশে পূরণ হয়েছে বলা যায়।

(৯) কলেজ, বিশ্ববিদালয়, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন সংরক্ষণ এবং সিভিল সার্ভিস এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকুরীতে কোটা সংরক্ষণ বিষয়ে জনসংহতি সমিতির দাবী একটা জরুরী দাবী নয়। কারণ উপরোক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সরকার বহু পূর্বেই কার্যকরী করেছেন। যদিও তাতে জনসংহতি সমিতির দাবী শতকরা একশ ভাগ পূরণ হয়নি। জনসংহতি সমিতির কিছু কিছু দাবী উপরে আলোচিত দাবীগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় সেগুলির আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে ছয়বার বৈঠকে মিলিত হয়ে কোন সমঝোতায় উপনীত হতে পারেনি। তাই স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সব দাবী পূরণ হওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। জনসংহতি সমিতি মূল পাঁচ-দফা দাবীর উপর আলোচনা চালিয়ে গেলে হয়তোবা তাদের অনেক দাবীই আদায় করা যেত। কৌশলগত ভুলের জন্য জনসংহতি সমিতি দাবী আদায়ের এই সুযোগ হারিয়েছেন। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির অংশ গ্রহণ এবং ভূমিকা ছাড়াই স্থানীয় সরকার পরিষদ নামের স্বশাসন ব্যবস্থা পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ মেনে নিয়েছেন - এই অজুহাতে জনসংহতি সমিতি তা প্রত্যাখান করেছে।

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা জনসংহতি সমিতির মাধ্যমে সমাধানের আশা উপজাতীয় জনগণ বিগত সতের বছর বুক বেঁধে ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের আশাভংগ হয়েছে। তাই তারা আশায় বুক বেঁধে বসে থাকতে আর আগ্রহী নয়। স্থানীয় সরকার পরিষদই হচ্ছে জনসংহতি সমিতির বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠার একটা যথাযথ ফোরাম। পার্বত্য অঞ্চলের তিন

স্থানীয় সরকার পরিষদ আজ যথার্থভাবেই সেই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা প্রর্বতনের পর থেকে জনসংহতি সমিতি আজ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগণ, তথা "জুম্ম জাতিকে" আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার আদায়ের নামে পরিচালিত কোন আন্দোলনেই জনসংহতি সমিতি আজ উপজাতীয় জনগণের সমর্থন আদায় করতে পারছেনা। তাই উপজাতীয় জনগণ তথা "জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার " আদায়ের নামে নিজেদের নেতৃত্ব এবং সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখার লক্ষে জনসংহতি সমিতি ভিন্ন নাম ধারণ করে এই আন্দোলন জিইয়ে রাখতে চাইছে। জনসংহতি সমিতির প্রতি উপজাতীয় জনগণের মোহ ভংগের কারণেই জনসংহতি সমিতিকে এভাবে কৌশল পরিবর্তন করতে হয়েছে।

সৌজন্যে ঃ তিন পার্বত্য জেলায় - স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা, ২ জুলাই ১৯৯১, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা

রাজধানী রাজানগরের সপ্তদশ শতকের চাকমা রাজপুরী
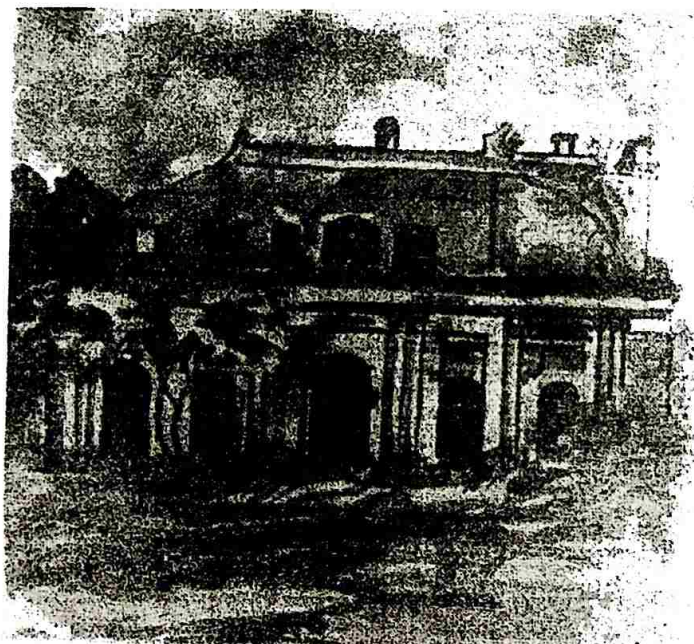
রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরস্থ
চাকমা রাজ বাড়ী ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাক্‌মা-বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭)
চাক্‌মা জাতির জীবনধারা

*সুপ্রকাশ রায়**

চট্টগ্রাম জেলার সমতলভূমির উপরিভাগে অবস্থিত পাহাড়-পর্বতময় অঞ্চলটির নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি 'যাযাবর চাষীদের বাসস্থান। প্রকৃতির কঠোরতা এবং ততোধিক দুর্ধর্ষ ও বন্য প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর সংগ্রাম করিয়া ইহাদের জীবন ধারণ করিতে হয়'। ১

ভারতবর্ষের অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের মতই এই অঞ্চলের চাক্‌মা, কুকি প্রভৃতি পার্বত্য অধিবাসীরা প্রকৃতির সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ করে। সেই কঠোর সংগ্রামই তাহাদিগকে দুর্ধর্ষ করিয়া তুলিয়াছে।

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলটি প্রথমে ছিল কুকি জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসস্থান। পরে চাক্‌মাগণ কুকিদের আরও উত্তর-পূর্ব দিকে তাড়াইয়া দিয়া আরাকান অধিকার করে। কিন্তু ব্রহ্ম যুদ্ধের সময় (১৮২৪-৫২) মগেরা আসিয়া চাক্‌মাদের বিতাড়িত করিয়া চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ অংশ অধিকার করিলে চাক্‌মাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে-প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে। ২

এই অঞ্চলের পার্বত্য আদিম অধিবাসীরা এমনকি মোগল যুগেও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। সেই যুগেও তাহারা তাহাদের নিজস্ব স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা অক্ষত ও অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। তখন তাহারা কঠোর কায়িক পরিশ্রমে প্রস্তরময় অনুর্বর জমিতে যে শস্য উৎপাদন করিত তাহার সামান্য একটা অংশ রাজস্ব হিসাবে মোগল সম্রাটদের দিয়া তাহারা স্বাধীন ভাবেই বাস করিত। কিন্তু এই অঞ্চলটি ইংরেজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহের পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যায় এবং অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের মত এই পর্বত-অরণ্যচারী আদিম মানুষগুলিও

ক্রমশ ইংরেজরাজের শোষণ-ব্যবস্থার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ক্রমশ এই অঞ্চলের উপরেও ইংরেজরাজের শোষণযন্ত্রগুলি একে একে চাপিয়া বসিতে থাকে।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি দ্বারা ইংরেজদের 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' মীর কাশিমের হস্তে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার নবাবী দান করিয়া প্রতিদান স্বরূপ বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। সুতরাং সেই সঙ্গে এই ক্ষুদ্র চাকমা রাজ্যটি ও পার্শ্ববর্তী স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য ইংরেজ বণিকদের কুক্ষিগত হয়। সেই সময় হইতেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠি ও উহার শোষণের অনুচরগণ এই অধিবাসীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। এই আদিবাসীদের জীবনধারা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেকজান্দার ম্যাকেঞ্জি সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

"আদি চট্টগ্রাম বৃটিশ অধিকারে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই পার্বত্য অঞ্চলের কোন অংশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই সময় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পার্বত্য অঞ্চলে দুইজন মাত্র পাহাড়িয়া দলপতির সন্ধান পাইয়াছিল। তাহাদের একজন ছিল 'ফ্রু' (Phru) নামক আদিম জাতির নায়ক, অপর জন চাকমা জাতির নায়ক। এই দলপতিগণ মুসলমান শাসকদের নিকট রাজস্ব হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্পাস পাঠাইত। তাহারা প্রথমে বৃটিশ শাসকদিগকেও কার্পাসের দ্বারা রাজস্ব দিত। কিন্তু রাজস্বের কার্পাসের পরিমাণ সম্ভবত এক এক বৎসর এক এক রূপ হইত। এই জন্যই প্রতি বৎসর এই 'কার্পাস মহল' একজন ফড়িয়ার (Speculator) নিকট ইজারা দেওয়া হইত। এই ইজারাদার ফড়িয়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত কার্পাস-রাজস্ব আদায়ের চুক্তি করিত এবং এইভাবে এই অঞ্চলের সমস্ত কার্পাস একচেটিয়া করিয়া ফেলিত।" ৫

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের মতে, মোগল যুগেই 'কার্পাস মহল' বা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফড়িয়া বা 'স্পেকুলেটর' নামক শোষকদলের আর্বিভাব ঘটে। ইংরেজ শাসকগণ এই পার্বত্য আদিম জাতিগুলির উপর তাহাদের শোষণ-যন্ত্রের অপরিহার্য অংশ রূপে এই ফড়িয়াদের লেলাইয়া দেয়। ফড়িয়ারা ইংরেজ শাসকদের সহিত রাজস্ব আদায়ের চুক্তি করিয়া নানাবিধ উৎপীড়ন দ্বারা 'কার্পাস মহলের' প্রস্তরময় অনুর্বর জমিতে পাহাড়িয়াদের অমানুষিক পরিশ্রমে উৎপন্ন একমাত্র শস্যের উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করে।

এই অঞ্চলের আদিম প্রথায় চাষবাস ও ভূসম্পত্তি-প্রথার নিম্নোক্ত বিবরণটি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের গ্রন্থে পাওয়া যায়ঃ

"যে প্রথায় সকল পাহাড়িয়া জাতি জমি চাষ করিত, তাহার নাম 'জুম' প্রথা। প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে গ্রামের সমস্ত লোক কোন একটা সুবিধাজনক স্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করে। তাহার পর প্রত্যেক পরিবারের সকল লোক জঙ্গল কাটিয়া চাষের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি আবাদ করিয়া লয়। ফসল পাকিবার সময় বন্য পশুপক্ষীর হাত হইতে শস্য রক্ষা করিবার জন্য তাহারা 'জুম' বা দল বাঁধিয়া সারা রাত্রি জমি পাহারা দেয়। দুই বৎসর চাষের পর জমির উর্বরা -শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়। এইভাবে যখন গ্রামের চারিপাশের সমস্ত উর্বর জমি চাষ করা হইয়া যায়, তখন সকল লোক ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করে। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রথায় চাষের ফলে কোন জমির উপরেই 'জুমিয়াদের' (যাহারা জুম চাষে অংশ গ্রহণ করে) স্থায়ী স্বত্ব জন্মিতে পারে না, এবং এই সকল জমির

রাজস্ব নির্ধারণ করিবারও কোন উপায় থাকে না। এই জনাই এমনকি দলপতিরাও জমি বা বনের উপর কোন ব্যক্তিগত অধিকার দাবি করে না।"৬

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্মা প্রভৃতি আদিবাসীরা এইভাবে অনুর্বর পার্বত্য জমিতে তুলার ফসল ফলাইয়া এবং সেই তুলা চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে লইয়া আসিয়া উহার বিনিময়ে চাউল, লবণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত।

শোষণ-পদ্ধতি

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলের পার্বত্য আদিম অধিবাসীরা ছিল যাযাবর চরিত্রের মানুষ। ইংরেজ শাসনের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরেও ইহাদের মধ্যে জমির উপর ব্যক্তিগত স্বত্বের উদ্ভব হয় নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব না হইবার ফলে ইংরেজ শাসকগণ প্রথমে এই অঞ্চলের উপর তাহাদের প্রত্যক্ষ শোষণের জাল বিস্তার করিতে না পারিয়া পরোক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। পরোক্ষ ব্যবস্থাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ ইংরেজ শাসকগণ বাহিরের কোন ব্যক্তির সহিত কার্পাস-কর আদায়ের চুক্তি করিয়া তাহাকে পার্বত্য অঞ্চল ইজারা দিত। ইজারাদার বিভিন্ন কৌশলে এই সরল প্রকৃতির পার্বত্য অধিবাসীদের নিকট হইতে রাজস্বের নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা হইতে কয়েক গুণ অধিক তুলা আদায় করিয়া আনিত এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা শাসকদের নিকট জমা দিয়া বাকি তুলা আত্মসাৎ করিত। ইহার পর ঐ তুলা বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লাভ করিত। অবশ্য ইজারাদার ইংরেজ প্রভুদের সম্মতি লইয়াই ইহা করিত। শাসকগণ রাজস্ব হিসাবে যে তুলা পাইত তাহা বিক্রয় করিয়া মুদ্রায় পরিণত করিবার জন্য অন্য কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করিত। এই চুক্তিতে মুদ্রার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা থাকিত। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শাসকগণের হস্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিয়া বাকি তুলা হইতে ফটকাবাজি দ্বারা (স্পেকুলেশন) প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করিত।৭

এই ব্যবস্থার ফলে পার্বত্য অধিবাসিদের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রথমত, প্রথম ইজারাদারটি তাহাদের নিকট হইতে রাজস্বের নামে প্রায় সমস্ত তুলাই লুটিয়া লইত। দ্বিতীয়ত, তাহার লুণ্ঠনের পর যে সামান্য পরিমাণ তুলা বাকি থাকিত তাহা চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে লইয়া গিয়া উহার বিনিময়ে বা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে আদিবাসীদের পক্ষে খাদ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা দ্বিতীয় ব্যক্তিটির জন্য অসম্ভব হইয়া উঠিত। কারণ, সেই ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে ঐ অবশিষ্ট তুলা নামমাত্র মূল্যে তাহার নিকট বিক্রয় করিতে আদিবাসীদের বাধ্য করিত। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা সমান ওজনের দ্রব্যের বিনিময়ে সমান ওজনের দ্রব্য লইতে অভ্যস্ত ছিল। সুতরাং তুলার ব্যাপারী দুই টাকা মূল্যের এক মণ লবণের বিনিময়ে আট টাকা মূল্যের এক মণ তুলা আত্মসাৎ করিত। এইভাবে কোন একটি বা দুইটি দ্রব্য ক্রয় করিতেই আদিবাসীদের সমস্ত তুলা নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই উভয়বিধ শোষণের ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসীরা অনিবার্য মৃত্যুর মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অবশেষে তাহারা আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল।

প্রথম বিদ্রোহ (১৭৭৬-৭৭)

প্রথম চাক্মা-বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকারী রেকর্ডে কেবলমাত্র একখানি পত্রের উল্লেখ দেখা যায়। এই পত্র দ্বারা চট্টগ্রামের তৎকালীন কালেক্টর গভর্নর -জেনারেল ওয়ারেন

হেস্টিংসকে এই বিদ্রোহের সংবাদ দিয়াছিলেন। এই পত্রে কালেক্টর সাহেব নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেনঃ

"রামু খাঁ নামক এক পাহাড়িয়া তুলার চাষের জন্য কোম্পানীকে সামান্য রাজস্ব দেয়। আমার এই স্থানে আসিবার পর হইতে, ইজারাদারগণের দুর্ব্যবহারের জন্যই হউক,অথবা তাহার বিদ্রোহ চরিত্রের জন্যই হউক, রামু খাঁ কয়েক মাস যাবৎ কোম্পানীর ইজারাদারগণের সহিত ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা চালাইতেছে ....রামু খাঁকে বন্দী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।" ৯

"কিন্তু কালেক্টরের এই চেষ্টা সফল হয় নাই, কারণ রামু খাঁ তাঁহার বাসস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে।" ১০

পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা রূপে আসিয়া আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি, ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন, আর এইচ এস হাচিন্সন্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারিগণ চাক্‌মা জাতির এই বিদ্রোহ ও অন্যান্য বিদ্রোহ সম্পর্কে বহু তথ্য খুঁজিয়া বাহির করেন। ইহাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন লুইন-এর বিবরণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে চাক্‌মাগণ প্রথমবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন চাক্‌মা-দলপতি 'রাজা' শের দৌলত ও তাঁহার সেনাপতি রামু খাঁ। ইহারা উভয়ে ছিলেন পরস্পরের আত্মীয়। রামু খাঁ সাধারণের নিকট 'সেনাপতি' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। চাক্‌মাদের উপর সেনাপতি রামু খাঁর অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ইংরেজ শাসকদের দ্বারা নিযুক্ত ইজারাদারগণের শোষণ-উৎপীড়ন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে রামু খাঁ ও শের দৌলত চাক্‌মা জাতির সকল লোককে একত্র করিয়া ইজারাদারি ও ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্যে প্রস্তুত হন। প্রথমে কার্পাস-কর দেওয়া বন্ধ হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারগণের তুলার গোলা লুন্ঠিত হয়। রামু খাঁর নেতৃত্বে চাক্‌মাগণ ইজারাদারদের বড় বড় ঘাঁটি ধ্বংস করিয়া ফেলে। রাঙ্গুনিয়া প্রভৃতি স্থানের বড় বড় গোলা লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত তুলা বিদ্রোহীরা লইয়া যায়। ইজারাদার ও কর্মচারীগণ চাক্‌মা অঞ্চল হইতে পলায়ন করে এবং বহু কর্মচারী চাক্‌মাদের হস্তে নিহত হয়।

ইংরেজ শাসকগণ ইজারাদারের সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং এই অঞ্চলের সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করে। চাক্‌মাগণ তাহাদের তীর -ধনুক ও বর্শা দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া গভীর পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়া পড়ে। ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের কোন সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসে। চাক্‌মাগণ সুযোগ বুঝিয়া আবার অগ্রসর হয় এবং চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া ইজারাদারের ঘাঁটি ও ব্যাপারীদের দোকান প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। ইংরেজ বাহিনী আবার পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু এবারেও বিদোহীরা গভীর পার্বত্য অঞ্চলে অদৃশ্য হইয়া যায়।

এইভাবে বিদ্রোহী চাক্‌মাদের দমন করা অসম্ভব বুঝিয়া শাসকগণ নুতন কৌশল অবলম্বন করে। চাক্‌মাগণ সমতল ভূমির বিভিন্ন বাজারে আসিয়া তাহাদের উদ্বৃত্ত তুলার বিনিময়ে বাজার হইতে খাদ্য, লবণ প্রভৃতি সংগ্রহ করিত। শাসকগণ জানিত যে, চাক্‌মারা তুলা বাজারে লইয়া আসিতে না পারিলে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে না এবং খাদ্যাভাবে শেষ

পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং তাহারা সমতল ভূমির বিভিন্ন বাজারের পথে বহু স্থানে সৈন্যের পাহারা বসাইয়া চাকমাদের বাজারে আসা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করে। অবশেষে তাহাদের এই কৌশল সাফল্য লাভ করে, চাকমাগণ বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। রামু খাঁ ইংরেজ শাসকগণকে ৫০১ মণ তুলা বার্ষিক রাজস্ব স্বরূপ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১১

এই প্রথম চাকমা বিদ্রোহ ও উহার প্রধান নায়ক রামু খাঁর নাম এখনও চাকমা জাতির স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই, এখনও নাকি চাকমাগণ এই বিদ্রোহ ও রামু খাঁর কাহিনী গর্বের সহিত স্মরণ করে। ১২

দ্বিতীয় বিদ্রোহ (১৭৮২)

প্রথম বিদ্রোহের পর হইতে রামু খাঁর আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে চাকমা দলপতি শের দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জানবক্স্ খাঁ 'রাজা' (দলপতি) নির্বাচিত হন। "জানবক্স্ খাঁ জমিদার বলিয়া নিজে নিজের পরিচয় দিলেও তিনি বহুকাল পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন"। ১৩ জানবক্স্ খাঁ দলপতি হইয়া চাকমা অঞ্চলে ইজারাদারগণের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। ১৭৮৩ হইতে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত কোন ইজারাদারই এই অঞ্চলে প্রবেশ করিতে বা রাজস্ব আদায় করিতে পারে নাই। সেই হেতু ইংরেজ প্রভুরা ইজারাদারগণের উপর সদয় হইয়া ১৭৮৩, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের খাজনা মকুব করিয়াছিলেন। ১৪ জানবক্স্ খাঁর সময় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে চাকমাগণ আবার বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের কারণ স্বরুপ ক্যাপ্টেন লুইন লিখিয়াছেনঃ

"ইজারাদারগণ এই উপজাতির উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। তাহার ফলে বহু চাকমা নিকটবর্তী আরাকান অঞ্চলেও পলায়ন করিয়াছিল। চাকমাগণ জানবক্স্ এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। কিন্তু শাসকগণ পূর্বের মত অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা আবার তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে।" ১৫

এই বিদ্রোহের সময়েও ইংরেজ বাহিনী চাকমাদের দমন করিতে পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু জানবক্স্ ও সকল চাকমা গভীর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিয়া এই অভিযান ব্যর্থ করিয়া দেয়। ১৬

তৃতীয় ও চতুর্থ বিদ্রোহ (১৭৮৪-৮৭)

জানবক্স্ খাঁর নেতৃত্বে চাকমাগণ আবার বিদ্রোহ করে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিদ্রোহ বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। জানবক্স্ অবশেষে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বশ্যতা স্বীকার করেন।

হাচিন্সনের বিবরণে দেখা যায়, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই আর একজন শের দৌলত খাঁর নেতৃত্বে চাকমাদের আর একটি বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ইহাকে হাচিন্সন দ্বিতীয় শের দৌলত খাঁর নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শের দৌলত খাঁ বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৭

ইংরেজ শাসক, ইজারাদার ও স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের সৃষ্ট অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে চাকমাগণ কোন কোন সময় আপস করিলেও যতদিন পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের

জন্য ইজারা প্রথা বলবৎ ছিল, ততোদিন, অর্থাৎ ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকমা বিদ্রোহ চলিয়াছিল। বিদ্রোহকালে চাকমাগণ যে পদ্ধতিতে উন্নত অস্ত্র সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।সেই যুদ্ধ ছিল একালের গেরিলা- যুদ্ধেরই অনুরূপ। ইংরেজ বাহিনী চাকমা অঞ্চলে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহারা সম্মুখ যুদ্ধে বাধা দিবার চেষ্টা না করিয়া স্ত্রী পুত্র ও অস্থাবর সম্পত্তিসহ গভীর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিত এবং এইভাবে ইংরেজ বাহিনীকে গভীর পার্বত্য অঞ্চলে টানিয়া লইয়া যাইত। ইংরেজ সৈন্যগণ চাকমাদের গ্রাম, বাড়িঘর, ক্ষেতের শস্য সমস্ত কিছু জ্বালাইয়া দিতে দিতে অগ্রসর হইত। এইরূপে দুর অভ্যান্তরে প্রবেশ করিয়াও যখন ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের সন্ধান পাইত না তখন তাহারা ফিরিতে আরম্ভ করিবামাত্র বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হইত। চাকমাগণ বড় বড় গাছ কাটিয়া পার্বত্য-পথগুলি বন্ধ করিয়া, পর্বত-গহ্বরের মুখে ফাঁদ পাতিয়া ও পানীয় জল নষ্ট করিয়া দিয়া ইংরেজ বাহিনীকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিত। তাহার পর তাহারা গোপন স্থান হইতে বিষাক্ত তীর বৃষ্টি করিয়া দলে দলে ইংরেজ সৈন্য সংহার করিত। ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চৌদ্দ বৎসরে কত ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহী, যে বিদ্রোহী চাকমাদের বিষাক্ত তীরে প্রাণ দিয়াছে, কত সৈন্য ফাঁদ-পাতা পর্বত -গহ্বরে পড়িয়া এবং পানীয় জলের অভাবে পিপাসায় ছটফট করিয়া মরিয়াছে তাহার হিসাব নাই। ইংরেজ শাসকগণ অস্ত্রের জোরে বিদ্রোহী চাকমাদের পরাজিত করিতে সক্ষম হয় নাই, পার্বত্য অঞ্চলে খাদ্যের অভাবে এই অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে অর্থাৎ সমতল ভূমির হাট-বাজারে আসিয়া তূলার বদলে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়াই তাহারা শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই অঞ্চল ইজারাদারের মারফত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা যতদিন বর্তমান ছিল ততদিন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সমস্তব হয় নাই। ইজারা-প্রথার অবসান করিয়াই ইংরেজগণ এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

চাকমাগণ বার বার বিদ্রোহ করিবার ফলে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়িয়া উঠে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের এবং ইজারাদারদের অবাধ শোষণ ও বর্বরসুলভ উৎপীড়নই চাকমা-বিদ্রোহের কারণ, যতদিন এই ইজারা -প্রথার অবসান না হয় ততদিন চাকমাগণ শান্ত হইবে না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকারের প্রধান বাণিজ্যকর্তা হ্যারিস সাহেব সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া 'রেভিনিউ বোর্ড'- এর নিকট সুপারিশ করেন যে, ইজারাদারের হস্তে ন্যস্ত পার্বত্য অঞ্চলের কার্পাসের একচেটিয়া বাণিজ্য-প্রথা রহিত করিয়া সরাসরি জুমিয়াদের বা চাকমা দলপতির সহিত বন্দোবস্ত করা উচিত। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইংরেজ শাসকগণ স্থির করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইজারা - প্রথা রহিত করা হইবে এবং কার্পাস -কর তুলিয়া দিয়া জুমিয়াদের বা চাকমা সর্দারগণের সহিত পরিমিত জমা (টাকা) ধার্য করা হইবে। ইহা ব্যতীত আশ্বাস দেওয়া হইল যে, এই কর নিয়মিতভাবে কালেক্টরের নিকট জমা দিলে উহা আর বৃদ্ধি করা হইবে না। ১৮ কিন্তু শাসকগণ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। এই সময় আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছিল যে, চাকমাদের নিকট হইতে কর স্বরূপ তুলা আদায় করিবার নিমিত্ত সরকারের পক্ষ হইতে একজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে। এই কর্মচারী কর বাবদ দেয় সমস্ত তুলা আদায় করিয়া পরে তাহা নিলামে বিক্রয়

করিবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা করা হইত না, সমুদয় তুলা ঢাকাস্থিত কোম্পানীর ফ্যাক্টরিতে চালান দেওয়া হইত। ১৯ রামু খাঁর সময় রাজস্ব হিসাবে ৫০১ মণ তূলা ধার্য হইয়াছিল। রামু খাঁর মৃত্যুর পর ৫০১ মণ তুলার পরিবর্তে ১৮১৫ টাকা ধার্য হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫০১ মণ তূলার মূল্য আরও বর্ধিত করিয়া টা.২২২৪.৪ পাই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। পরে আপসের শর্তানুসারে চাক্‌মা সর্দারগণই এই রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া কালেক্টরের অফিসে জমা দিত।
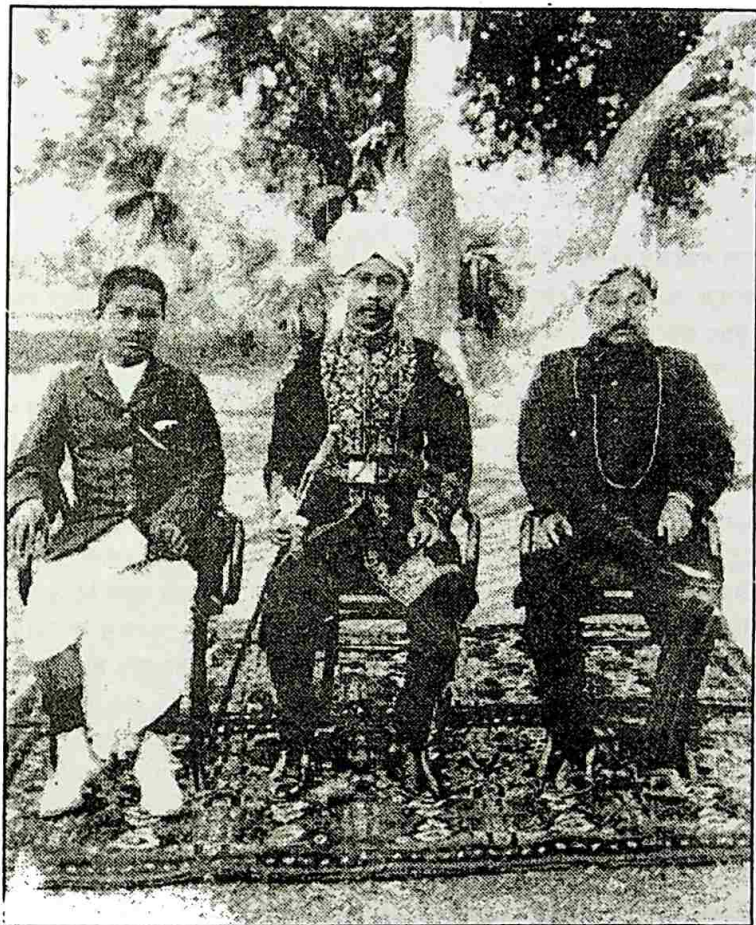
দুই সঙ্গী সহ রাজা ভূবন মোহন রায়

৬ জুম্ম জাতীয়তাবাদ

জগদীশ চাক্‌মা

মানব সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বের কোন কোন জাতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছে আবার কোন কোন জাতি অতি দেরীতে অগ্রসর হতে পেরেছে। আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতি যেমনি বিলুপ্ত হয়ে গেছে তেমনি অনেক ছোট-বড় জাতি স্বতন্ত্রভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে স্ব-স্ব অস্তিত্ব সমুন্নত রেখে সকল ক্ষেত্রে বিকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে আসন লাভে সমর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের অনেক পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজ দ্রুত বিকাশমান। পক্ষান্তরে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বের ত্রিশ কোটি জনসংখ্যার অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতি (Indigenous People) আজ চিরতরে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এসব বিলুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মধ্যে অনেক জাতি সমষ্ঠিগতভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে মরণপণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যে আজ নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমি ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করছে। আর অনেকেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে শাসক-শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও "আজ জুম্ম জাতিয়তাবাদ" এর উন্মেষ ঘটিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ আজ সমষ্ঠিগতভাবে জুম্ম জাতি হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে এবং জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জাতীয়তাবাদের মূল প্রবক্তা। জনসংহতি সমিতি তার প্রচারপত্রে, পুস্তিকায়, বুলেটিনে এই "জুম্ম" শব্দটি শুরু থেকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে আসছে। বিপরীতভাবে কিন্তু সরকারী বেসরকারী নথিপত্রে এ ক্ষুদ্র জাতি সমূহকে এযাবত উপজাতি (Tribe) হিসেবে ভুল আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

জুম্ম ও জুম্ম জাতি

"জুম" থেকে "জুম্ম" - এই জাতিবাচক শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। জুম্ম শব্দটি দুটো অর্থ নির্দেশ করে। প্রথমতঃ সাধারণভাবে ধান, তিল, তুলা, মরিচ, শাকসব্জি ইত্যাদি একই সাথে কোন পাহাড় বা উচ্চভূমিতে চাষ করা হয়ে থাকলে সেই খাদ্য-শস্যে পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রকে "জুম" বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মূলতঃ পাহাড় অর্থে "জুম" শব্দটি বুঝানো হয়ে থাকে। তাই "জুম" কথাটি "পাহাড়" (উচ্চভূমি) শব্দের সমার্থক অর্থ নির্দেশ করে। "জুম্ম" অর্থ হচ্ছে "পাহাড়ের অধিবাসী" বা পাহাড়ী (High landers)। কিন্তু জুমচাষী (জুমিয়া) ও জুম্ম শব্দ দু'টি সমার্থক নয়। কেননা যারা জঙ্গল কেটে, আগুনে পুড়ে পাহাড়ে চাষ (Slash and burn cultivation or shifting cultivation) করে খাদ্যশস্য ফলায় তাদেরকে জুমচাষী (জুমিয়া) বলা হয়। পক্ষান্তরে যারা যুগ যুগ ধরে পাহাড় ও উচ্চভূমিতে বসবাস করে আসছে তাদেরকে জুম্ম (পাহাড়ী) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অবশ্য অনেকের মতে, জুম্ম শব্দটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা শব্দ। পার্বত্যবাসী সকলকে চট্টগ্রামবাসীরা জুম্ম নামে অভিহিত করে। অন্যভাবে বলা যায় সকল পার্বত্যবাসীরা পাহাড়ে বাস করে বলে তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয়। তাই জুম্ম বলতে মূলত পাহাড়বাসী বা পাহাড়ীকে বুঝানো হয়। Willem Van Schendel এর মতে - They (the people of the Chittagong hills) were now called Jumma. An old pejorative term for slash and burn cultivation in the Chittagonian dialect of Bengali, it had been appropriated by the JSS in its attempt to unify all hill people under one social umbrella. P -26) [1]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে "জুম" কথাটি কোন একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির একমাত্র ব্যবহৃত শব্দ নয়। ইহা সরকারীভাবে স্বীকৃত ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত একটি শব্দ।

জুম্ম (পাহাড়ী) জাতি কথাটা শোনামাত্র নানা জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কারণ প্রায় তিন দশকের আগে জুম্ম জাতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কোথাও জানা বা শোনা যায়নি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ও কালের আবর্তে পরিবর্তিত বাস্তবতার আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন ভূখন্ডের বিভিন্ন জাতির ন্যায় আজ পার্বত্য চট্টগ্রামেও "জুম্ম জাতি" ও "জুম্ম জাতীয়তাবাদের" উন্মেষ ঘটেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমি ও চাক - দশ ভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ সমষ্ঠিগতভাবে আজ জুম্ম জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠি অথবা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠি সমষ্টিগতভাবে যে জাতি গড়ে তোলে সেই জাতির মধ্যে অবশ্যই অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকতে দেখা যায়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখযোগ্য -

(১) জাতি হলো, ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত একটি জনসমষ্টি আর এই জনসমষ্টি একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগ ধরে বসবাস করে।

(২) এই জনসমষ্টির নির্দিষ্টভাবে বসবাসের জন্যে সুনির্দিষ্ট ভূ-খন্ড অর্থাৎ নির্দিষ্ট আবাসভূমি।

(৩) একই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা।

(৪) ভাষাগত ঐক্য ও সাদৃশ্য অর্থাৎ জনসমষ্টির পরস্পরের মধ্যে ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাগত মিল থাকা।

(৫) একই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অভ্যস্থ এই জনসমষ্টির মধ্যে একই মানসিক গড়ন গড়ে উঠে। এই মানসিক গড়ন একটা সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

অতএব, উপরোক্ত বৈশিষ্টসমূহের আলোকে জুম্ম, জুম্মজাতি ও জুম্ম জাতীয়তাবাদ নিছক কোন কথার কথা নয়, বরঞ্চ ইহা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের প্রকৃত পরিচিতি।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি

জুম্ম জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে ভাবগত ও বাহ্যিক উভয় প্রকার উপাদান বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বাহ্যিক উপাদানগুলির চেয়ে ভাবগত উপাদানটি অপরিহার্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহ্যগত ও ভাবগত ঐক্য - মূলতঃ ঐক্যবোধের ভিত্তি বাহ্যিক নয়, মানসিক। কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভাবগত ঐক্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকভাবে সংগঠিত ও বিকশিত একটি জনসমষ্টি জাতীয়তাবোধে গভীরভাবে জাগরিত হতে পারে। অধ্যাপক রেনা বলেন - The idea of nationality is essentially spiritual in character. জুম্ম জাতীয়তাবাদেরও মূলভিত্তি হচ্ছে এই ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে - চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমী ও চাক - এই ভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের অধিকারী হিসেবে বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে তারা নিজেদের আবাসভূমি ও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা অঞ্চল হিসেবে পরিচিহ্নিত করে আসছে। অতএব, জুম্ম জাতিসমূহের বৃহত্তর জাতি গঠন তথা জুম্ম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রধানতম ভিত্তি হচ্ছে এই নির্দিষ্ট আবাসভূমি রক্ষার চিন্তা-চেতনা এবং অনুপ্রেরণা।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি জাতিসমূহের অভিন্ন অর্থনৈতিক জীবন ধারন পদ্ধতি যা বৃহত্তর জাতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপাদান হিসেবে পরিগণিত। একদা পার্বত্য জাতিসমূহের প্রধান জীবিকা ছিল জুম চাষ। কালের আবর্তে জুম চাষ এখন গৌণ হলেও অঞ্চলের মোট আয়তনের নয়-দশমাংশ জায়গা পাহাড়-ভূমি হওয়ায় পাহাড়ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতি এখনও প্রাধান্য বিস্তার করে আছে যা বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের উৎপাদন ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহ একই অর্থনৈতিক জীবন ধারায় একই সম্পূর্ণতার (a single whole) মধ্যে প্রোথিত হয়ে যুগ যুগ ধরে একে অপরের সান্নিধ্যে এসেছে এবং বৃহত্তর জুম্ম জাতীয়তাবোধে বিকশিত হওয়ার ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে।

যে কোন সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি সেই সমাজের সকল সামাজিক ক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র নিরুপণ করে। পার্বত্য জাতিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, অভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকলেও অভিন্ন উৎপাদন প্রণালীর কারণে তাদের মধ্যে অভিন্ন মানসিক গড়ন গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আর পার্বতা চট্টগ্রাম উর্বর ভূমি ও অঢেল সম্পদে পরিপূর্ণ। তাই অল্প ও সহজ পরিশ্রমে প্রচুর উৎপাদন সম্ভব। এই সহজ, সরল ও ক্ষুদে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে গড়ে উঠে জুম্মাদের সহজ সরল শান্তিপ্রিয় মানসিক গড়ন বা জাতীয় চরিত্র। পাশাপাশি এই মানসিক গড়ন জুম্ম তথা পাহাড়ীয়া জীবনধারা কেন্দ্রীক এক সাধারণ সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনধারা। পার্বত্য জাতিসমূহের মধ্যেকার সামাজিক সত্তায় বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বস্তুতঃ এসবের মৌল উৎস জুম্ম অর্থনীতি তথা পাহাড়ীয়া জীবন প্রণালী। তাই আনুমানিক ও মৌলগতভাবে বস্তুতঃ পার্বত্য জাতিসমূহের অভিন্ন এক সম্পূর্ণতার (single whole) মধ্যে আবদ্ধ। দৈহিক তথা মানসিক গড়ন ও সাংস্কৃতিক এই মৌলিকগত অভিন্নতাই বৃহত্তর জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে উর্বর করেছে।

জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান ভাষাগত ঐক্য পার্বত্য জাতিসমূহের মধ্যে অনুপস্থিত। অভিন্ন ভাষার উপাদান অনুপস্থিত থাকলেও বৃহত্তর জাতীয়তাবদের ভিত্তি দুর্বল হতে পারে না। তাই পার্বত্য জাতিসমূহের এই ভাষাগত বৈসাদৃশ্য বৃহৎ জুম্ম জাতীয়তাবাদের উত্তরণে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। নেদারল্যান্ডের ইয়াসমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক Willen Ven Schendel বলেন - It is difficult to see them as an ethnic group in the traditional, cultural sense; they share neither a single language nor a single religion. The type of collective identity the term Jumma seeks to create is based more on social than on cultural characteristics, and the fact that the inhabitants of the Chittagong hills now frequently use the terms Jumma people and Jumma nation to refer to themselves indicates that a process of nation building is under way. p -26 [2]

উল্লেখ্য যে, বর্তমান তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিশ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির পক্ষে এককভাবে সংগ্রাম করে বড় জাতিগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন। তাছাড়া স্মরণাতীতকাল থেকে একই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থানের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সহাবস্থানের অবিচ্ছেদ্যতা গড়ে উঠে। তাই সম্মিলিত শক্তির সমাবেশ ঘটানোর অভিন্ন প্রয়োজনীয়তা ও শাসনতান্ত্রিক অবিচ্ছেদ্যতা জুম্ম জনগনকে বৃহত্তর জুম্ম জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

সর্বোপরি জুম্ম জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠার আর একটা অন্যতম ভিত্তি হলো অভিন্ন শাসন শোষণের শিকার। শত শত বছর জুম্ম জনগণ সকলেই জাতীয় সামন্ত প্রভুদের নির্মম ও অগণতান্ত্রিক শাসন-শোষণে সমভাবে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। পাশাপাশি রয়েছে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠির অব্যাহত দমনপীড়ন। এই শাসন-শোষণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন জাতিসত্তাই রেহাই পায়নি। প্রত্যেকে সমভাবে সামন্তবাদ, উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও

ইসলামী সম্প্রসারণবাদের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই তাদের মধ্যে এই অভিন্ন পরাধীনতা থেকে আশু মুক্তি ও গনতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার এক সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয় এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক তথা জাতীয় চেতনায় সম্মিলিতভাবে উদ্বুদ্ধ হতে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ অনুপ্রাণিত হয়।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

জুম্ম জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের কারণ হিসেবে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করেছেন। Institute of Bangladesh Studies এর গবেষক মোঃ মুহিবুউল্লাহ ছিদ্দিক এর মতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী সামন্তবাদী ব্যবস্থার উৎখাত করতে এই জুম্ম জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। তাছাড়া তিনি কাপ্তাই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ অধিবাসীদের অবহেলা, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহনে চাকমা যুবকদের বাঁধাদান, চীনপন্থী মনোভাব, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর হত্যা, লুঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণের ক্ষোভ, পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনবিধি রহিতকরণ প্রভৃতি জুম্ম জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের কারণ বলে উল্লেখ করেন।[3].

অন্যদিকে জুম্ম বিজয় চাকমা নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখ করেছেন। যথা - ১) বহিরাগত ও সামন্ত প্রভুদের শাসনশোষণ, ২) কাপ্তাই বাঁধ, ৩) স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন দলের গণবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, ৪) প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ইন্দন, ৫) উপজাতীয়দের আত্মরক্ষামূলক মনোভাব ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ, ৬) সরকারী উদ্যোগে বাঙ্গালী পুনর্বাসন, ৭) ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নেতৃত্বের ভাঙ্গন ও ৮) অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও জাতীয় নেতৃত্বের উদাসীনতা - [4].

উপরোক্ত আলোচনায় জুম্ম জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণ হিসেবে বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলেও মূলতঃ রাজনৈতিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই এর প্রধান কারণ।

রাজনৈতিক কারণ ঃ পার্বত্য জাতি সমূহের স্বকীয়তা ও অস্তিত্বে আঘাত হানা হয় সর্বপ্রথম ভারত বিভক্তির সময়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনকে লঙ্ঘন করে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অন্তর্ভুক্তি তৎকালীন জুম্ম নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেনি। ফলস্বরূপ রাঙ্গামাটিতে ভারতের পতাকা ও বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন জুম্ম নেতৃবৃন্দ। কিন্তু পাকিস্তান সরকার বেলুচ রেজিমেন্ট পাঠিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে নেয়।

পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির বিরোধী এই ঘটনা পরবর্তীতে জুম্ম জনগণের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা ঘটায়। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি জুম্ম জনগণকে ভারতপন্থী বলে আখ্যা দিতে থাকে। শুরু হয় প্রশাসনিক বঞ্চনা। ১৯৪৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার করে বাঙ্গালী পুলিশ নিয়োগ করা হয়। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে জুম্ম জনগণকে বঞ্চিত করা হতে থাকে। তদুদ্দেশ্যে গৃহীত হয় জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী বিভিন্ন পদক্ষেপ। এসময় ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লংঘন করে বাঙ্গালী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটানো

হয়। কাপ্তাই বাঁধ তৈরী করে জুম্ম জনগণের আর্থিক মেরুদন্ড ভেঙে দেয়া হয়। তদুপরি ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সুবিধানুসারে সংশোধন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখলের দ্বার উন্মোচন করা হয়।

এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জুম্ম জাতিসত্তাগুলির অস্তিত্ব চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পরে। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী পানছড়ি ও দীঘিনালায় হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ চালায় ও আত্মসমর্পনকারী জুম্ম রাজাকারদের হত্যা করা হয়। তখন প্রকাশ্যে জুম্ম জনগণকে পাকিস্তানপন্থী আখ্যা দিয়ে রাজাকার, মুজাহিদ, মিজো দমনের নামে ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন চালানো হয় এবং শত শত জুম্মকে জেল-হাজতে পাঠানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এসময় এসব অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নকারী কমিটির কাছে জুম্ম জনগণের জাতীয়সত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে ৪ দফা দাবীনামায় স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। কিন্তু তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার এসব দাবীসমূহ উপেক্ষা করে জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সংবিধান রচনা করে। জুম্ম জনগণের স্বকীয়তা ও অস্তিত্বের এই সাংবিধানিক অস্বীকৃতি জুম্ম জাতীয়তাবাদকে পরোক্ষভাবে উজ্জীবিত করে ও তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আত্ম সচেতন ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠে।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ জুম্ম জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের দ্বিতীয় কারণ হলো অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা। সুদূর বৃটিশ আমল থেকে জুম্ম জনগণ সমতলবাসী বহিরাগত ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দ্বারা চরমভাবে শোষিত হয়ে আসছে। বর্তমানেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও ব্যবসা বাণিজ্য বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণে। সুদখোর বাঙ্গালী মহাজনদের নিকট জুম্ম জনগণ চরমভাবে শোষিত।

অর্থনীতির অন্যান্য উৎপাদন খাতেও জুম্ম জনগণ চরমভাবে বিপর্যস্ত। যেমন কাপ্তাই বাঁধের ফলে হাজার হাজার জুম্ম নিজ বাস্তুভিটা ও জমি থেকে উচ্ছেদ হলেও কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জুম্মদের চাকরী দেয়া হয়নি। অনুরূপভাবে কর্ণফুলী পেপার মিলে ১০/১২ জন জুম্ম নিয়োগ করা হয় মাত্র। কাপ্তাই হ্রদে জেলেদের পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭২-৭৩ সালে লাইসেন্সধারী জেলেদের মধ্যে ৩১% পাহাড়ী, ২৮.৪৯% বাঙ্গালী হিন্দু ও ৩৯.৫৫% মুসলমান। কিন্তু ১৯৯০ সালে জেলেদের অনুপাত দাঁড়ায় পাহাড়ী ১%, হিন্দু ২৬% ও মুসলমান ৭৩% [5].

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী (১ম-৪র্থ) শ্রেণীর নিয়োগ ক্ষেত্রে জুম্মরা সংখ্যালঘু। তবে ইদানীং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জুম্ম কর্মচারীর আনুপাতিক হার কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আর ১৯৫৯-৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে বিশেষ করে চাকমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়। এ বাঁধের ফলে ১ লক্ষ-অধিবাসী উদ্বাস্তু ও

হাজার হাজার পরিবার ভূমিহীন হয়ে পড়ে। কৃষকদের নতুন বসতি এলাকায় অর্ধেকমাত্র জমি দেয়া হয়। উদ্বাস্তুদের সঠিক পুনর্বাসন দেয়া হয়নি।

এরূপ অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার ফলে জুম্ম জনগণ ভূমিহীন ও তাদের মধ্যে একটা অংশ সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে। এই নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ক্রমাবনতির ফলে জুম্ম জনগণ তাদের অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার প্রতি সচেতন হয়ে উঠে। এভাবে অর্থনৈতিক কারণে জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রেরণার সূচিত হয়।

ধর্মীয় ও অনুপ্রবেশ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মরা বিগত শতাব্দীগুলিতে তিন ধর্মের অনুসারী হলেও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে এসেছে। একমাত্র ধর্মীয় কারণে জাতিগুলির মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। প্রত্যেক ধর্মানুসারীরা নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে এসেছে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে বাঙ্গালী মুসলিমদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশের পর জুম্ম ও অজুম্মদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে বিরোধ দেখা দিতে থাকে। বিশেষ করে সেই সময়ে বাজারে শুকরের মাংস বিক্রির ব্যাপারে রেংখ্যং, লংগদু ও নানাচর প্রভৃতি বাজারে জুম্ম অজুম্মদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। পরবর্তীকালে অনুপ্রবেশের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির ফলে এই ধর্মীয় সংঘাত ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে হাজার হাজার বহিরাগত পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল করতে থাকে। অসাধু সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে ভূয়া ভূমি দলিল তৈরী, হয়রানী করে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা, সামান্য ঋণকে বহু গুণ বাড়িয়ে জমি জবর-দখল এভাবে অনুপ্রবেশকারীরা জমি বেদখল করে নেয়। এই ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও ব্যাপক জমি বেদখলের ফলে জুম্ম জনগণ অসহায় ও ভূমিহীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জুম্ম জনগণ অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠে এবং একতাবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়। এভাবে ধর্মীয় ও ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রস্ফুটিত হয় জুম্মদের মধ্যে।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে (২রা নভেম্বর ১৯৭২ইং) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন "পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা), ত্রিপরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, রিয়াং, মুরং ও চাক -এই দশটি ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে পাহাড়ী বা জুম্ম জাতি বলি।" পরবর্তীতে তিনি তার বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসমুহকে জুম্ম নামে অভিহিত করতেন। একমাত্র এই 'জুম্ম' নামের দ্বারা পার্বত্যাঞ্চলের সকল জাতিসমুহকে সহজে বুঝানো যায়। তাই এই জুম্ম নামটি প্রগতিশীল ও সচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা লাভ করে ও সাধারণ কথাবার্তা ও সভাসমিতির আলোচনায় ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন প্রচার পত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে সমষ্টিগতভাবে জুম্ম জাতি হিসেবে অভিহিত করে।

জুম্মা শব্দটি মূলতঃ দশ ভাষাভাষী জাতিসমুহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকগত ঐক্যের প্রতীক এবং সমষ্টিগত জাতীয় স্বকীয়তার নিদর্শন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবদের প্রবল উল্লাসে ম্রিয়মান সাংস্কৃতিক উজ্জীবিত করতে পার্বত্য জাতিসমূহ সচেতন হয়ে উঠে। বাংলা ভাষার পাশাপাশি পার্বত্য জাতিসমূহ নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিতে নুতন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটাতে সক্রিয় হয়ে উঠে। গঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক সংস্থা - যেমন -গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী, জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর ইত্যাদি। রচিত হয় জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা। সেই সাথে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে দেখা দেয় জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার। Willen Van Schendel এর ভাষায় - A remarkable cultural innovation occured which was reflected in the emergence of a new term to designate the people of the Chittagong Hills. They were now called Jumma. তিনি আরো লিখেছেন - The Jumma identity does not signify a return to the old Burmese cultural model: rather it is the first serious attempt to develop an indigenous model of state society and culture .... Attempts to revive the local linguistic heritage can also observed, e. g. in a trend towards giving new born babies Jumma .....names instead of Bengali names that were fashionable a generation ago [6]

কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই জুম্মা জাতীয়তাবাদ ও স্বাতন্ত্রতাকে আন্তর্জাতিকভাবে অস্বীকার করে আসছে। বাংলাদেশের জেনেভাস্থ স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাফলে আর ওসমানি আগষ্ট '৯২ এর জেনেভাতে অনুষ্ঠিত UN Sub-Commission of prevention of discrimination and protection of minorities এর সম্মেলনে বলেন যে, The people of the hill districts of Chittagong do not defer racially; religiously and economically from the people of other parts of Bangladesh. Race is a concept established by science - biological and anthropological. Both these discipline would bear out that the people of Bangladesh constitute one race - a mixed race. আর জুন '৯৩ এর ভিয়েনা আদিবাসী সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি বলেন যে, There is no tribe in Bangladesh called Jumma. বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও বাংলাদেশ সরকার আজ এই জুম্মা জাতীয়তাবাদকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে " ভাগ কর ও শাসন কর" নীতিতে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু পার্বত্য জাতিসমূহের আজ বুঝতে বাকী নেই যে, তারা বহিরাগতদের দ্বারা নিজ দেশে পরবাসী হতে চলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের বেদখলে চলে যাচ্ছে, তাদের স্বকীয়তার ও অস্তিত্বে চরম আঘাত এসেছে। একমাত্র সকল জাতিসমূহের সংঘবদ্ধ আন্দোলনই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায়। আর এই আন্দোলন গড়ে তোলার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে জুম্মা জাতীয়তাবাদ। সকল পাহাড়ী জাতি সমূহের ঐতিহ্য, সমতা ও একতার প্রতীক জুম্মা জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় আজ সকলের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তথ্য নির্দেশ

[1], [2] The Invention of the 'Jummas' ও [6] State Formation and Ethnicity in Southeastern Bangladesh
Willen Van Schendel, Department of History, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands.

[3] লোক (৩) বাংলাদেশ জাতিসত্তা সংকট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ।

[4] সংস্কৃতি, সংখ্যা ২৫তম, পৌষ ১৩৯৭, ডিসেম্বর ১৯৯০।

[5] সংস্কৃতি, সংখ্যা ২৫তম, পৌষ ১৩৯৭, ডিসেম্বর ১৯৯০।

সৌজন্যে ঃ জুম্ম সংবাদ বুলেটিন, ১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে

১২৮ পৃষ্ঠার পর

সা সা ঃ আগে জেএসএস/শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন প্রচার পত্রে কিংবা প্রকাশনায় লেখা থাকতো শান্তিবাহিনী হেড কোয়ার্টার "দীঘিনালা"। এখন আপনাদের প্রকাশনায় কোন ঠিকানা লেখা থাকে না। তবে কি শান্তিবাহিনীর বর্তমানে কোন হেড কোয়ার্টার নেই?

সন্তু ঃ জন সংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীসহ পার্টির অন্য কোন অংগ সংগঠনের প্রচারপত্রে কিংবা প্রকাশনায় এ পর্যন্ত কোন সময়েই জন সংহতি সমিতি অথবা শান্তিবাহিনীর অথবা অন্য কোন অংগ সংগঠনের হেড কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুতঃ শান্তিবাহিনীর কোন আলাদা হেড কোয়ার্টার নেই। পার্টির হেড কোয়ার্টারই হচ্ছে শান্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার। সুতরাং যেসব প্রচারপত্রে ও প্রকাশনায় "শান্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার - দীঘিনালা" - লেখা আছে সেসব প্রচারপত্রে বা প্রকাশনা অবশ্যই সশস্ত্র বাহিনীর মদদপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল দালাল গোষ্ঠি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিলো।

সৌজন্যে ঃ ভোরের কাগজ, ২৮.ও ২৯ অক্টোবর ১৯৯৫

৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা 'র সাক্ষাৎকার

পার্বত্য জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় নারায়ন লারমা ওরফে সন্তু লারমা তাদের গোপন আস্তানায় এক একান্ত সাক্ষাতকার দিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের রাজনীতি ও সামাজিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন সাংবাদিক সালিম সামাদ।

সালিম সামাদ ঃ সরকারের সংগে ৭ম সংলাপ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন সংলাপ ব্যর্থ হলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার আদায় করা হবে। এই সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলার প্রয়োজন হলো কেন?

সন্তু লারমা ঃ দেখুন, ৭ম সংলাপ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ ধরণের কোন কথা আমি বলিনি। অবশ্য উক্ত সংবাদ সম্মেলনে এক পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো "যদি চলমান ডায়লগ ব্যর্থ হয়, পাঁচ দফা, মৌলিক অধিকার না দেয় তবে হোয়াট ইজ ইয়োর নেক্সট স্ট্রাটেজী"? তখন আমি বলেছিলাম "আন্দোলন চলতে থাকবে - বাইশ বছর ধরে তো চলছে।"

সা সা ঃ সংলাপের বর্তমান অবস্থা কি? অনেকের ধারণা সংলাপে যেভাবে অগ্রগতি হবার কথা ছিলো সেভাবে হচ্ছে না। পার্বত্য সমস্যা সমাধানে বর্তমান সংলাপ কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে কি আপনি মনে করেন?

সন্তু ঃ সংলাপের বর্তমান অবস্থা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিগত এরশাদ সরকারের আমলে ছয় বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের কোন পথ খুজে পাওয়া যায়নি। এমনকি জন সংহতি সমিতির উপস্থাপিত পাঁচদফা দাবীনামাও এরশাদ সরকার কর্তৃক গ্রহণ করার পর পুনরায় ফেরৎ দেওয়া হয়ে থাকে। এরপর বর্তমান খালেদা জিয়া সরকারের সাথেও ইতিমধ্যে আটবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এ সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে সমিতির সংশোধিত পাঁচদফা দাবীনামা পেশ

করা হয় এবং সরকার পক্ষ থেকে এই পাঁচদফা দাবীর উপর উত্তরও লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ উত্তর অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ও অগ্রহণযোগ্য ছিলো। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ১৯৮৯ সালে এরশাদ সরকার কর্তৃক প্রণীত ও প্রদত্ত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের মাধ্যমে সমিতির পাঁচদফা দাবী পূরণ করা হয়েছে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেওয়া হয়েছে। বিগত ৭ম বৈঠকে সরকার পক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে চার সদস্য বিশিষ্ট একটা উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত উপ-কমিটির সাথে ৪ঠা জুন, ১৯৯৪ ইং একবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে পাঁচদফা দাবী তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রেক্ষিতে যেসব আলোচনা হয়েছে তাতে সরকার পক্ষের মনোভাব নিম্নোক্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে -(ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণের সাংবিধানিকভাবে জাতিগত স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে এবং (খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ আইনের মৌলিক দিকগুলো বজায় রেখে ও তিনটি জেলাকে নিয়ে একটা Apex Body গঠন করে এই স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধন করতঃ চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারে। সুতরাং সরকার পক্ষের সর্বশেষ এই বক্তব্য এবং সরকারের সাথে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সংলাপে তেমন কোন মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। অতএব পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানে সরকারের সদিচ্ছা বা আন্তরিকতার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে বলা যায়। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সরকার চট্টগ্রাম বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে , যে কারণে এ সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানে এখনো পর্যন্ত সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেই। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের প্রেক্ষাপটে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিগত এরশাদ সরকার ও বর্তমান খালেদা জিয়া সরকারের মধ্যে এ পর্যন্ত কোন মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়নি।

সা সা ঃ কমিটি ফর চিটাগাঙ হিল ট্রাক্টস (সিএইচটি) -তে যারা আছেন, তারা সবাই সংসদ সদস্য। তাদেরকে কি কখনো জিজ্ঞেস করেছেন সংসদে সিএইচটি নিয়ে আলোচনা হয় কিনা। হলে তা কতোখানি এবং কোন প্রেক্ষাপটে আলোচনা হয়েছে?

সন্তু ঃ হ্যাঁ। অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তবে সিএইচটি কমিটিতে বিরোধী দলের যারা রয়েছেন, তারাই শুধু বলেছেন যে, উনারা সিএইচটি সমস্যা ও এ সমস্যা সমাধানের উপর সংসদে বক্তব্য রেখেছেন এবং সমাধানের কথা রেখে সিএইচটি বিষয়ে আলোচনার জন্য বার বার দাবী উত্থাপন করে আসছেন। কিন্তু সরকারী দলের পক্ষ থেকে এ যাবৎ কোন সাড়া না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংসদে যথার্থ কোন আলোচনাই হতে পারেনি। বস্তুতঃ সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও এ সমস্যা সমাধানের উপর আলোচনার্থে বিরোধী দলসমূহ থেকে দলগতভাবে কোন প্রস্তাব আনা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। এযাবৎ সংসদে যা কিছু বক্তব্য দেওয়া হয়েছে সে সবই একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ের ছিলো বলে জানি।

সা সা ঃ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মিনিটস্ থাকে। আপনাদের সংগে সরকারের সংলাপ আলোচনায় তেমনি মিনিটস্ আছে কি? এছাড়া পরের মিটিংয়ে আগের মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত

নিয়ে আলোচনা হয় কি? কিংবা আগের মিটিংয়ের সংগে পরের মিটিংয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় কি?

সন্তু ঃ অবশ্যই মিনিটস্ থাকে। কিন্তু এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, আমাদের উভয় পক্ষের আলোচনার কোন মিনিটস্ নেই। মিনিটস রাখার জন্য জেএসএস এর পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছিলো, কিন্তু সরকার পক্ষের দলনেতা তথা সরকার পক্ষ মিনিটস্ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে পরবর্তীতে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো যে, বৈঠকে যা যা আলোচিত হবে তা স্ব স্ব পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং পরবর্তীতে তা উভয় পক্ষ থেকে মিলিয়ে দেখা হবে। সরকার পক্ষের এই অবাস্তব প্রস্তাব আমাদের পক্ষে গ্রহন করা সম্ভবপর ছিলো না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিগত সরকারের আমলেও প্রতিটি বৈঠকে মিনিটস্ করা হয়েছিলো। অথচ খালেদা জিয়া সরকার একটা নির্বাচিত সরকার হয়েও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরন করতে অপারগতা দেখিয়েছে যা সরকারের অসদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়। এটাও অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য যে - আগের মিটিংয়ের সংগে পরের মিটিংয়ে ধারাবাহিকতা যেমনি রক্ষা করা হয় না, তেমনি পরের মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয় না বলা যায়। প্রতিটি বৈঠক এজেন্ডা ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয় আর বৈঠকে সরকার পক্ষের দলনেতার উত্থাপিত বক্তব্যই শেষ পর্যন্ত এজেন্ডা হিসেবে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

সা সা ঃ পার্বত্য গণ পরিষদ ও সমন্বয় পরিষদ, সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে যে, শান্তিবাহিনীর সংগে আলোচনা বন্ধ করার জন্য। এই ধরণের প্রস্তাবে আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

সন্তু ঃ পার্বত্য গণ পরিষদ ও বাংগালী সমন্বয় পরিষদ সরকার ও সশস্ত্রবাহিনীর মদদে ও ছত্রছায়ায় গঠিত হলেও এসব সংগঠনের জুম্ম জাতি বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা ও নাশকতামূলক তৎপরতা চলমান
সংলাপের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম বলে মনে হয় না। তবে সরকার যদি চলমান বৈঠক বন্ধ করতে চায়, তাহলে এ প্রকারের সরকারী তাবেদার ও মদদপুষ্ট সংগঠনের দাবীর অজুহাত দেখিয়ে বৈঠক বন্ধ করার অপচেষ্টা হতে পারে বৈকি।

সা সা ঃ গত ডিসেম্বর সংসদে তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকার বলেছে শান্তি আলোচনার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আলোচনার সংগে নির্বাচন পিছানোর কি সম্পর্ক?

সন্তু ঃ শান্তি আলোচনার সংগে তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের বস্তুতঃ কোন সম্পর্ক নেই। নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত একান্তই সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যেহেতু এই স্থানীয় সরকার পরিষদ গণধিকৃত ও অবাঞ্ছিত বলে প্রমাণিত হয়েছে, পক্ষান্তরে সরকার এই অগণতান্ত্রিক, ত্রুটিপূর্ণ ও গণধিকৃত আইন আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে অন্যতম হাতিয়ার

হিসেবে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং এমনি অবস্থায় এই স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে ও শান্তি প্রক্রিয়ার উপর আঘাত দিতে পারে এই আশংকায় মনে করা হয় সরকার এ নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গণস্বার্থ পরিপন্থী এই জঘন্য আইনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছে।

সা সা ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শরণার্থীরা দেশে ফেরা শুরু করে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া শুরু হবার কিছু দিন পরেই হঠাৎ করেই শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ হয়ে যায়। কারণ কি?

সন্তু ঃ জুম্ম রিফিউজী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এ সম্পর্কে এসোসিয়েশনের ১৩ই মে ১৯৯৪ ইংরেজী প্রকাশিত রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। উক্ত রিপোর্টের মূল কথা হচ্ছে যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ষোল দফা গুচ্ছ প্রস্তাব যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না এবং প্রত্যাবাসিত ৩৭৯ পরিবারের মধ্যে অধিকাংশ পরিবার স্ব-স্ব ভিটেমাটিতে পুনর্বাসিত হতে পারেনি।

সা সা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) কি শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ রাখার ব্যাপারে একমত?

সন্তু ঃ জুম্ম শরণার্থী সমস্যা, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম রাজনৈতিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত একটা সমস্যা। এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে চাইলে প্রথমত ও প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। শরণার্থী প্রত্যাবাসন বিষয়টা একান্তই সরকারের ব্যাপার। তবে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে বরাবরই যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে আসা হচ্ছে।

সা সা ঃ শান্তিবাহিনী পুনরায় দাবী করছে যে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন স্থগিত করার জন্য। শান্তিবাহিনী কি শরণার্থীদের জিম্মি রেখে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে?

সন্তু ঃ না। শান্তিবাহিনী কোন সময়েই শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ করার জন্য দাবী জানায়নি। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসকরণ ও ভূমি বেদখলের হীন ষড়যন্ত্রের কারণেই শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান না করেই শুধুমাত্র শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনলেই যেমনি শরণার্থী সমস্যা সমাধান হতে পারে না, তেমনি শরণার্থীদের বিদেশে জিম্মি রেখেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বলা বাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে জন সংহতি সমিতি তার নিজস্ব প্রোগ্রাম -৫ দফা দাবীনামা ঘোষনা ও সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেছে। সুতরাং যারা শরণার্থীদের জিম্মি রাখার কথা বলে থাকে, তারা (বিশেষ মহল) প্রকৃতপক্ষে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করে তাদের ভিটেমাটি ও জমি বেদখল করতে একান্তই আগ্রহী।

সস ঃ শরণার্থীরা কি নিজ ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক না কি সরকারী উদ্যোগে?

সন্তু ঃ এ বিষয়টা জুম্ম শরণার্থীরাই ভালো বলতে পারবে।

সা সা ঃ জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির হিসাব অনুযায়ী রেজিস্টার্ড এবং আনরেজিস্টার্ড শরনণার্থী কতো?

সন্তু ঃ জুম্ম শরণার্থী কল্যান সমিতির বর্তমান রিপোর্ট অনুসারে ৫১, ৩৭৯ জন রেজিস্টার্ড এবং ৭, ১২২ জন আনরেজিস্টার্ড শরণার্থী রয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশ সরকার এই সংখ্যা নিয়ে কোন আপত্তি জানিয়েছে বলে আমার জানা নাই।

সা সা ঃ বেশ কিছুদিন আগে কল্পরঞ্জন চাকমা, এম,পি ভোরের কাগজে এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসছেন এবং তারা জমি জায়গা ফেরত পেয়েছেন। কথাটি কি ঠিক?

সন্তু ঃ শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, এম,পি তার নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয়। কারণ এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ প্রত্যাবাসিত শরণার্থী পরিবার স্ব-স্ব গ্রামে পুনর্বাসিত হতে পারেনি। শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এম, পি সরকারের বক্তব্যই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।

সা সা ঃ ৭০ দশকের মাঝামাঝি, দিল্লী শান্তিবাহিনীকে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে সীমিত পরিমাণে অস্ত্র দিয়েছিলো বলে বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জেনেছি। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

সন্তু ঃ কোন সময়ে দিল্লী শান্তিবাহিনীকে অস্ত্র দিয়েছে বলে আমার জানা নাই। কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যারা পাঁচ দফা দাবীর বিরোধিতা করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে চায় এবং যারা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ধ্বংস ও ভূমির অধিকার হরণ করে নিতে বদ্ধপরিকর তারাই এ ধরণের গুজব ছড়ায়।

সা সা ঃ বর্তমানে জেএসএস -এর সংগে ভারতের সম্পর্ক কোন পর্যায়ে রয়েছে?

সন্তু ঃ জেএসএস বাংলাদেশেরই একটা রাজনৈতিক সংগঠন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মধ্যে থেকে, জুম্ম জনগণের তথা বাংলাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে। জেএসএস জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। সুতরাং জেএসএস এর ন্যায় বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক দলের সাথে ভারত বা বাইরের অন্য কোন দেশের সম্পর্ক থাকার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ও অবাস্তব।

সা সা ঃ ভারত সরকার কি জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সংগে একমত?

সন্তু ঃ প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অবান্তর। কেননা এটা একান্তই ভারত সরকারের নিজস্ব ব্যাপার।

সা সা ঃ বাংলাদেশ প্রায়ই ভারতকে অভিযুক্ত করে বলে যে, ভারত "সন্ত্রাসী"দের মদদ দেওয়ার কারণে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি?

সন্তু ঃ অবাস্তব ও অবান্তর প্রশ্নের উপর কোন মতামত থাকতে পারে না।

সা সা ঃ ইদানীং জেএসএস পরিবর্তিত আকারে ৫ দফা রূপরেখা উল্লেখ করছে। আগের ৫ দফার সংগে বর্তমান ৫ দফার মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে?

সন্তু ঃ ৫ দফাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের দাবী করা হয়েছিলো পক্ষান্তরে সংশোধিত ৫ দফা দাবীনামায় আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করার দাবী রয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

সা সা ঃ বাংলাদেশের সরকার যদি পার্বত্যবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার মেনে নেবার পরে যদি প্রশ্ন ওঠে এতে সমতলবাসীর কি লাভ হয়েছে? সে ক্ষেত্রে আপনাদের বক্তব্য কি হবে?

সন্তু ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। সুতরাং এ সমস্যার যদি সমাধান হয়ে থাকে তাহলে তা বাংলাদেশের আপামর জনগণেরই লাভ।

সা সাঃ জেএসএস কি মনে করে সমতলবাসীরা তাদের স্বায়ত্ত শাসনের বিষয়টি মেনে নেবে?

সন্তু ঃ যারা বাংলাদেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং যারা গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও প্রকৃত জাতীয়তাবাদী, তারা অবশ্যই এই স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষে সমর্থন জানাবেন।

সা সা ঃ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাওয়ার পর তা বাস্তবায়নের জন্যে জেএসএস এর তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ কি কি হবে?

সন্তু ঃ সরকার ও জন সংহতি সমিতির মধ্যকার গৃহীত চুক্তি মোতাবেক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার বাস্তবায়িত হবে।

সা সা ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহী দলরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত অধিকার পাওয়া পর ক্ষমতাসীন হয়ে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছে। এ ক্ষেত্রে জেএসএস এমনি পরিস্থিতি ওভারকাম করার জন্যে কি কি পদক্ষেপ নেবে?

সন্তু ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর জেএসএস. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্যই আন্দোলন করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জন সংহতি সমিতি

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের বিশ্বাসী একটা রাজনৈতিক দল।

সা সা ঃ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার আদায়ের পর শান্তিবাহিনীর আত্মসমপর্ণের পদ্ধতি কি হবে এবং সামাজিক ভাবে তাদের **পুনর্বাসন** করা হবে কিভাবে?

সন্তু ঃ আগে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়াই হচ্ছে মূখ্য বিষয়!

সা সা ঃ স্বায়ত্ত শাসন পাবার পর চাকমা, মারমা এবং মং রাজার পদমর্যাদা কিভাবে নির্ধারণ করা হবে?

সন্তু ঃ জনসংহতি সমিতি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুতরাং অন্যান্য যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়টাও গণ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হতে পারে।

সা সা ঃ স্থানীয় সরকার পরিষদ, ইউনিয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন কল্যাণ পরিষদের অবস্থা কি হবে?

সন্তু ঃ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের রূপরেখা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন নির্ধারিত হবে।

সা সা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০ ভাষাভাষি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠি রয়েছে। স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হবার পর আঞ্চলিক পরিষদের আলোচনায় কোন ভাষা ব্যবহার করা হবে?

সন্তু ঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা হচ্ছে বাংলা। তাই আঞ্চলিক পরিষদেও বাংলা ভাষাই প্রধান ভাষা হতে পারে। আর ইংরেজী ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সা সা ঃ জেএসএস এর দাবি পার্বত্য এলাকা থেকে বাংগালী অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের জন্যে। এদিকে দেখা যাচ্ছে, আঞ্চলিক পরিষদে বাংগালীদের জন্য ৩টি আসন রিজার্ভ রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে এক ধরণের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না?

সন্তু ঃ ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সমস্ত বাংগালী ছিলেন তারা অবশ্যই অনুপ্রবেশকারী নন। তাদেরকে পার্বত্য চট্টগামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়া হয়ে আসছে। সাধারণভাবে তারা "পুরাতন বসতি বাঙালী" হিসেবে পরিচিত। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন ধরণের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

সা সা ঃ বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামাত, বামদল সবাই রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের কথা কোন দল সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে বলে আপনি মনে করেন?

সন্তু ঃ কতিপয় রাজনৈতিক দল এযাবত স্বায়ত্তশাসনের কথা তুলে ধরলেও কোন দল কর্তৃক এ পর্যন্ত এই স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা কি রকম হবে তা সুস্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়নি।

সা সা ঃ অস্ত্র বিরতি থাকাকালীন জেএসএস কি মনে করে সামরিক তৎপরতা আগের থেকে অনেক কমেছে? পার্বত্য চট্টগ্রাম -এ সরকারী প্রশাসনের ওপর সামরিক আমলাদের হস্তক্ষেপ কি কমেছে বলে মনে করেন? এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কি এখন বেসামরিকীকরণ হয়েছে বলে মনে করেন?

সন্তু ঃ না। বাহ্যতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনের উপর সামরিক আমলাদের হস্তক্ষেপ ও সামরিক তৎপরতা যুদ্ধবিরতীকালীন কমেছে বলে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে জুম্ম জনগণের উপর সামরিক সন্ত্রাস ও দমননীতির কোন পরিবর্তন হয়নি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণেরও কোন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বরাবরই যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী লঙ্ঘন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ এখনো চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জিওসি 'র হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

সা সা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে সামরিক আমলারা কি আগ্রহী? এ ব্যাপারে জেএসএস এর অভিমত কি?

সন্তু ঃ বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে বরাবরই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে একটা রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। সুতরাং এ সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে সামরিক আমলাদের আগ্রহ ও অনুকূল ভূমিকা থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

সা সা ঃ আমাদের তথ্য অনুযায়ী যুদ্ধ বিরতিকালীন সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ীদের বাধ্যতামূলক শ্রম (ফোর্সড লেবার) নিয়োগ বন্ধ করেছে। এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি সরকারের এ্যামনেস্টি ঘোষণার বিষয়টিকেই বা আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

সন্তু ঃ বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে কোন ধরণের বাধ্যতামূলক শ্রম (জবরদস্তিমূলক শ্রম) নিষিদ্ধ হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আইন কার্যকর করা হচ্ছে না। কেননা জুম্ম জনগণকে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োগকরণ কোন সময়েই বন্ধ করা হয়নি। যুদ্ধ বিরতি সময়েই হোক বা অন্য যে কোন সময়েই হোক এ পর্যন্ত নানাভাবে জুম্ম জনগণকে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োগ করে একদিকে তাদেরকে নির্যাতন নিপীড়ন করা হচ্ছে, আর অন্যদিকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের মনোবল ও ঐক্য শক্তি ভেঙে দেয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এ ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে আগের ও বর্তমান সরকারগুলো বার বার তথাকথিত সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে আসছে। অথচ এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের প্রেক্ষাপটে সরকারের বিন্দুমাত্র সততা ও আন্তরিকতা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

সা সা ঃ এ্যামনেস্টি সময়ে কতোজন শান্তিবাহিনীর সদস্য এই সুযোগ গ্রহণ করেছে? যারা সুযোগ নিয়েছে তাদের আত্মসমর্পণের নেপথ্যে কি কারণ রয়েছে?

সন্তু ঃ ভবতোষ-প্রীতি-দেবজ্যোতি-ত্রিভঙ্গিল- এই চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৮২ সালে যখন পার্টিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন থেকেই বিশেষতঃ বাংলাদেশ সরকার তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দিয়ে আসছে। এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেয়ার মুখ্যতঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে, পার্টিতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন নস্যাৎ করে দেওয়া। অবশ্য এটা কারো অজানা নয় যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা প্রদান কাউন্টার ইনসারজেন্সির অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তা সত্ত্বেও দলীয় কর্মীদের মধ্যে অনেকেই সরকারের এই ফাঁদে পা দিতে দ্বিধাবোধ করে না। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত আত্মসমর্পিত বিভেদপন্থীদের বাদে ২৫৭ জন শান্তিবাহিনী তথা জন সংহতি সমিতির সদস্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করেছে। তথাকথিত এ সুযোগ গ্রহণের নেপথ্যে অনেক কারণ থাকতে পারে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, শারীরিক অযোগ্যতা, ক্লান্তি ও হতাশা, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা, দীর্ঘদিন পর্যন্ত কঠোর জীবনযাপনে অপারগতা, দুর্নীতিগ্রস্ততার কারণে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হওয়া, নীতি আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ইত্যাদি।

সা সা ঃ বিভিন্ন সময়ে সরকারী বাহিনীর কাছে শান্তিবাহিনীর যেসব সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে, পরবর্তীতে তাদের অনেকেই আবার শান্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। তাহলে তাদের অপরাধ কি আত্মসমর্পন করা?

সন্তু ঃ এ প্রকারের কোন হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে বলে আমার জানা নাই। শান্তিবাহিনী তথা পার্টির ভাবমূর্ত্তির উপর আঘাত হানার জন্যই কায়েমী স্বার্থবাদীরা এ রকম অপবাদ দিয়ে থাকে।

সা সা ঃ বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লজ্ঘনের হার তুলনামূলকভাবে কি কমেছে?

সন্তু ঃ অবশ্যই কমেনি। এখনো প্রতিদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন না কোন অঞ্চলে জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

সা সা ঃ জেএসএস এর মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব কমেছে কি?

সন্তু ঃ এখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। তবে আশি দশকের গোড়ার দিকে উপদলীয় চক্রান্তকারী ভবতোষ (গিরি) প্রীতিকুমার (প্রকাশ) দেবজ্যোতি (দেবেন) ত্রিভঙ্গিল (পলাশ) এর ষড়যন্ত্রে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিলো সে রকম কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা এখানে যদি বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে তার উত্তরে বলবো যে - না। পার্টিতে

সে রকম কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। বরঞ্চ বলা যায়, জেএসএস এর নেতৃত্বে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ, সংগ্রামী, সংহত ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

সা সা ঃ জেএসএস কি হিল ট্র্যাক্ট ম্যানুয়েল ১৯৯০ রাখতে চায়, নাকি সেটার পরিবর্তন - পরিবর্ধন করতে চায়?

সন্তু ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জেএসএস পাঁচদফা দাবীনামা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের নিকট উপস্থাপন করেছে।

সা সা ঃ জেএসএস পার্বত্য এলাকার কোন কোন ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ এবং কি কি বিষয় নিষিদ্ধ করতে চায়?

সন্তু ঃ জেএসএস কর্তৃক উপস্থাপিত পাঁচদফা দাবী ও আঞ্চলিক পরিষদ এর রূপরেখায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে।

সা সা ঃ পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন কি জেএসএস এর অঙ্গ সংগঠন? কারণ তাদের রাজনৈতিক দাবির সংগে আপনাদের রাজনৈতিক দাবির মিল রয়েছে?

সন্তু ঃ না। এসব সংগঠন জন সংহতি সমিতির কোন অঙ্গ সংগঠন নয়। জন সংহতি সমিতি রাজনৈতিক দাবির সংগে এসব সংগঠনের দাবির কোন সাদৃশ্য থাকলে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতার কারণেই হয়েছে বলে বলা যেতে পারে।

সা সা ঃ পার্বত্য এলাকায় সরকারের কোটি কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই উন্নয়ন পাহাড়ীদের ভাগ্য উন্নয়নে কতোখানি সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?

সন্তু ঃ এটা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার জুম্ম জনগণের উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সিংহভাগই পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সশস্ত্রবাহিনীর ব্যয়ভার, অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন ও কাউন্টার ইনসারজেন্সিতে ব্যয় করা হচ্ছে। সরকার যেখানে নীতিগতভাবে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর সে ক্ষেত্রে উক্ত কোটি কোটি টাকার তথাকথিত প্রকল্প জুম্ম জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক হওয়ার কথা একান্তই অবাস্তব ও অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়।

সা সা ঃ জেএসএস কি তাদের আন্দোলনের ব্যাপারে পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সমর্থন আদায় করতে পেরেছে? আর এই আন্দোলন চালাতে সামরিক এবং প্রশাসনিক যে বিশাল ব্যয়, তা কিভাবে সংগ্রহ করা হয়?

সন্তু ঃ জন সংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। আর এই সংগঠন দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণ নিয়েই গঠিত হয়েছে ও জুম্ম জনগণের সক্রিয় সমর্থনে সুদীর্ঘ ২২ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছে। যেহেতু জন সংহতি সমিতি ও এর সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী, ব্যাপক জুম্ম জনগণের সমর্থন পুষ্ট। তাই জুম্ম জনগণের স্বতস্ফুর্ত অনুদান ও সাহায্য নিয়েই জন সংহতি সমিতির ব্যয়ের সিংহ ভাগই মেটানো হয়ে

থাকে। তা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবসা বানিজ্য ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের থেকেও চাঁদা সংগ্রহ করে আন্দোলনের আংশিক খরচ মেটানো হয়। সর্বোপরি জন সংহতি সমিতির নিজস্ব উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকেও পার্টির ব্যয়ভার আংশিকভাবে লাঘব করা হয়ে থাকে।

সা সা ঃ জেএসএস এর বর্তমান কাঠামো এবং শান্তিবাহিনীর কাঠামোর স্বরূপটি কি?

সন্তু ঃ জেএসএস একটি রাজনৈতিক দল। এর অনেকগুলো অঙ্গ সংগঠন রয়েছে। তারমধ্যে সামরিক সংগঠন হিসেবে শান্তিবাহিনী ও মিলিশিয়া বাহিনী রয়েছে। জেএসএস এর নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীসহ অন্য সব অঙ্গ সংগঠন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য জেএসএস এর কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বের মতোই কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পার্টির সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে।

সা সা ঃ আপনাকে আমরা মৃত বলে জানতাম। হঠাৎ জানা গেলো আপনি জেএসএস এর সভাপতি। এই গুজব সৃষ্টি হলো কিভাবে?

সন্তু ঃ এটা তারাই ভালো বলতে পারবে যারা আমাকে মৃত বলে গুজব ছড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এবং আন্দোলনে বিভ্রান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যেই কায়েমী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এ গুজব সৃষ্টি করেছিলো।

সা সা ঃ দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আপনার অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে শান্তিবাহিনীর মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি আসে এবং চরম সংকট দেখা দেয়। তারই পরিণতিতে মানবেন্দ্র লারমার মৃত্যু ঘটে এবং ২ হাজার শান্তিবাহিনীর সদস্য সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ সংকটকে কি আপনারা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন?

সন্তু ঃ কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমার অন্তর্ভুক্তির কারণে পার্টির চরম সংকট দেখা দেয় ও পরিণতিতে পার্টি প্রতিষ্ঠাতা ও জুম্ম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র লারমার মৃত্যু ঘটেছে, কথাটা সম্পূর্ন ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ আমি জনসংহতি সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই এ যাবৎ কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য হিসেবে রয়েছি। এমনকি আমি যখন বিনা বিচারে অন্তরীণ ছিলাম সেই সময়েও আমাকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। ১৯৭৭ সালের জাতীয় সম্মেলনে (আমি তখন জেলে ছিলাম) আমাকে ফিল্ড কমান্ডারের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। ১৯৮০ সালে বিনাশর্তে কারামুক্ত হই। কিন্তু ১৯৮১ সালের ১৯শে মার্চ পুনরায় আমাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে মুক্তি লাভের পর পরই আমি আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে আসি এবং ফিল্ড কমান্ডারের দায়িত্বসহ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্বভার পালন করতে থাকি। এরপরে ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে আমি পুনরায় বিপুল ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। আর কার্যকরী কমিটির একজন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর পরই আমাকে পুনরায় শান্তিবাহিনী ও মিলিশিয়া বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে।বস্তুতঃ ভবতোষ, প্রীতিকুমার, দেবজ্যোতি ও ত্রিভঙ্গিল এই চার কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে পার্টিতে উপদল সৃষ্টি হয়। এই চার কুচক্রী ক্ষমতার লোভে ও দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে সর্বোপরি নীতি-আদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল

শক্তির মদতেই পার্টির অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে থাকে। ফলতঃ পার্টিতে ১৯৮৩ সালের গোড়ার দিকে চরম সংকট দেখা দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কারামুক্ত হওয়ার পর পুনরায় আমার আত্মগোপনে চলে আসার আগেই কিন্তু চার কুচক্রীর এই উপদলীয় চক্রান্তের জাল অনেক বিস্তার লাভ করেছিলো। তাই ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে এই ষড়যন্ত্রের পূর্ণ মাত্রায় বিস্ফোরণ ঘটেছিলো, যদিও জাতীয় সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনে চার কুচক্রী চরমভাবে পরাজিত হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও চার কুচক্রী বিভেদপন্থীরা অচিরেই আবার ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে আরম্ভ করে। কিন্তু পার্টির নেতা নেতৃত্ব ও নীতি-আদর্শের প্রতি অনুগত, অবিচল ও সংগ্রামী কর্মীবাহিনী এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসে। ফলশ্রুতিতে বিভেদপন্থীরা শান্তি প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয় এবং নতুন উদ্যোগে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার প্রদান করে থাকে। শর্তসাপেক্ষে উভয়পক্ষে একটা শান্তি চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিলো। কিন্তু এই শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করে চার কুচক্রী রাতের অন্ধকারে গোপনে ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইংরেজ পার্টি প্রতিষ্ঠাতা, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু মানবেন্দ্র লারমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পার্টির অভ্যন্তরস্থ এই চম সংকটের ফলে চার শতাধিক বিভেদপন্থী সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর সেই সাথে পার্টির বেশ কিছু সংখ্যক নিষ্ঠাবান কর্মীও বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তথাপি সঠিক নীতি , আদর্শ ও নেতৃত্ব সেই সাথে বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান সংগ্রামী কর্মীবাহিনী ছিলো বলেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার আন্দোলন থেমে যায়নি। বরঞ্চ প্রতিক্রিয়াশীল, দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতালোভী, আদর্শহীন ও সুবিধাবাদী উপদলীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণেই যেমনি আন্দোলনে অধিকতর গতি সঞ্চারিত হয়েছে তেমনি দলীয় নেতৃত্ব নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আরো ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়েছে।

সা সা ঃ বর্তমানে জেএসএস এর বাঙালী বসতির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত?

সন্তু ঃ ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট থেকে অনুপ্রবেশকারীদের (বহিরাগতদের) অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবী করা হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্ত আলোচনার অবকাশ রয়েছে বলে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের নিকট অভিমত দেওয়া হয়েছে।

সা সা ঃ আপনারা কিছুদিন আগে বাঙালী বসতিকারীকে অনুপ্রবেশকারী বলতেন। এখনো কি তাদের এ বিশ্লেষনেই আখ্যায়িত করছেন?

সন্তু ঃ ১৯[illegible]০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিনানুমতিতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন কোন ব্যক্তিই পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি ক্রয়, বন্দোবস্তী ও বসতি স্থাপন করতে পারেন না। সুতরাং ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্ট থেকে এ পর্যন্ত যারা অনুপ্রবেশ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছে সেসব বহিরাগতদের প্রত্যেকেই জন সংহতি সমিতি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছে।

১১৬ পৃষ্ঠার দৃষ্টব্য

৮ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এর রাঙ্গামাটি আগমনোপলক্ষে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মারকলিপি

উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীরোত্তম এর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাবলী অনুধাবন কল্পে আগত অনুসন্ধান কমিটির রাঙ্গামাটি আগমনোপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য প্রেসিডেন্ট সকাশে উপজাতীয় জনগণের "স্মারকলিপি"

মান্যবরেষু!

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক পরিবেশ, অধিবাসীদের স্বতন্ত্র জীবনধারা, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের সমস্যাসমূহ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমস্যা হইতে ভিন্নতর।

কাপ্তাই বাঁধের ফলে এবং তৎপরবর্তীকালে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা পরিস্থিতিকে আরও জটিলতর ও কঠিনতর করিয়া তুলিয়াছে।

উপনিবেশিক শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাসমূহ অনুধাবনের কোন চেষ্টাই কোন কালে করা হয় নাই এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে এই জেলার জনগণ চিরকাল অবহেলিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে অনেক সরকারী আশা ও আশ্বাসের বাণীতে আমরা ভারাক্রান্ত হইয়াছি সত্য, কিন্তু বাস্তবে এই সব আশ্বাসের ছায়াও আমরা দেখি নাই।

১৯৭২ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারী উপজাতীয় প্রধানগণ এবং অপরাপর নেতৃবর্গের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপিতে উপজাতীয় জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার যে দাবী উত্থাপিত হইয়াছিলো তাহা তৎকালীন সরকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎপরবর্তী কালেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ যে সমস্ত স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন সেগুলিও অনুরূপভাবেই উপেক্ষিত হয়।

অত্যন্ত উৎসাহ এবং আশার বিষয় এই যে, বর্তমান সরকার এই চির অবহেলিত পার্বত্যভূমির সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং সরকারের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও সদিচ্ছার প্রতিফলন স্বরূপ আমরা আজ এই মহতী সম্মেলনে আপনার প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমে আপনার নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাদি তুলিয়া ধরার এবং কতিপয় প্রস্তাব নিবেদন করার সুযোগ লাভ করিয়াছি।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি!

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে যারা উপজাতীয়, যারা এই মাটিরই আসল এবং আদিম সন্তান উন্নয়নক্ষেত্রে তাহারাই সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের দাবী রাখে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ কালে এই জেলার উপজাতীয় জনগণের সংখ্যানুপাত ছিল শতকরা ৯৭ জন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সুযোগ এবং কৌশলে অনুপ্রবেশকারী ও ভাসমান জনসংখ্যা বাদ দিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সংখ্যানুপাত অপরিবর্তিতই রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় উন্নয়ন বাস্তবমুখী হইতে গেলে উপজাতীয় জনগণের স্বার্থকেই সন্মুখে রাখিয়া যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিতে হইবে নতুবা তথাকথিত উন্নয়ন বাস্তবক্ষেত্রে অবনয়নে পর্যবসিত হইবে।

বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই জেলায় অবস্থিত ইহা এই জেলার পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, কাপ্তাই হ্রদের সুনীল বিস্তার এবং তাহার নয়নাভিরাম দৃশ্য আগন্তকদের মনোহরণ করে ইহাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দিগন্ত বিস্তারী জলরাশির অনেকখানি উপজাতীয়দের রক্ত ও অশ্রুতে ভরা একথা কেহ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? দূর সর্পিত বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়া কেবল বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়না, লক্ষাধিক উপজাতীয় জনগণের দীর্ঘশ্বাসও প্রবাহিত হয়। দেশের সামগ্রিক স্বার্থ এবং উন্নয়নের জন্য বাংলার কোন অঞ্চল এতখানি আত্মত্যাগ করে নাই। তাই কেবল এই একটিমাত্র প্রকল্পের বিনিময়েই এই অঞ্চল আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য স্বার্থত্যাগের দায়মুক্তির দাবী করিতে পারে।

অতএব মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপজাতীয় জনগণের কাতর আবেদন এই যে, ভবিষ্যতের যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়নের সময় একমাত্র উপজাতীয় কল্যাণের প্রতিই যেন দৃষ্টি রাখা হয় যাহাতে উন্নয়নের নামে বহিরাগতদের স্বার্থে অরণ্য প্রকৃতির সম্পদ লুন্ঠনের দ্বার উন্মুক্ত না হয়।

হে মহামান্য রাষ্ট্রপতি!

এই অবহেলিত অরণ্য জনপদের ততোধিক অবহেলিত জনগণের উপরোক্ত আবেদন আপনি সদয় চিত্তে গ্রহণ করিবেন আশা করিয়া উন্নয়ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী আপনার অনুমোদন ও আশু বাস্তবায়নের জন্য নিবেদন করার প্রয়াস পাইতেছি।

উপজাতীয়গণের শিক্ষায় অনগ্রসরতা প্রবাদস্বরূপ শিক্ষা উন্নয়নের জন্য :-

ক) বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়ের আর্থিক মঞ্জুরী বৃদ্ধি করা হোক।

খ) খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন মহকুমার প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক ন্যূনপক্ষে উক্ত মহাকুমাদ্বয়ে বেসরকারী প্রচেষ্টায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত দুইটি

মহাবিদ্যালয়কে অবিলম্বে সরকারী স্বীকৃতি এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক মঞ্জুরী দানের ব্যবস্থা করা হোক।

গ) উপজাতীয় ছাত্রগণের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখা হোক।

ঘ) শিক্ষার যে সব ক্ষেত্রে উপজাতীয় ছাত্রগণ আকৃষ্ট হয় নাই সেসব ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে বিশেষ বৃত্তি সহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

ঙ) বৌদ্ধ ছাত্রগণের বৃত্তির পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হোক।

চ) ত্রিপুরা ও অন্যান্য উপজাতীয় ছাত্রগণের জন্য আলাদা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হোক।

ছ) উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে উপজাতীয়দের জন্য বিশেষ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হোক।

জ) উপজাতীয় ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তি বিতরণের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া সরকারী ও বেসরকারী সদস্য সহ গঠিত কমিটি কর্তৃক বিতরণের ব্যবস্থা করা হোক।

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার একটি দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান সোপান। কিন্তু পূর্ব হইতেই সমতলবাসিগণ কর্তৃক এই ক্ষেত্র এমনভাবে অধিকৃত হইয়াছে যে, বস্তুতঃ বর্তমানে উপজাতীয়গণের এক্ষেত্রে প্রবেশের সম্ভাবনা রুদ্ধ হইয়াছে। উপজাতীয় জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এমন কতগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা যথাঃ--দোকানের প্লট সংরক্ষিত রাখা, সহয শর্তে শিল্প এবং বাণিজ্যিক ঋণের বন্দোবস্ত করা, কর-রেয়াত, বিভিন্ন লাইসেন্স ও পারমিট লাভের সুযোগ ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে তাহাদিগকে সমতলবাসিগণের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে না হয়।

আবহমান কাল হইতে জুম কৃষিকে অবলম্বন করিয়া উপজাতীয়গণ জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিতেছে। ভূমির উর্বরতা হ্রাসের দরুন এই প্রক্রিয়ায় কৃষিকাজ পরিত্যক্ত হওয়ায় অথচ বিকল্প কোন জীবিকার উপায় না থাকায় উপজাতীয়গণের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন দুর্বল হইশা পড়িতেছে। কৃষিক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের হৃদ্‌পিন্ড স্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট কৃষি এলাকা কাপ্তাই বাঁধের ফলে নিমজ্জিত হওয়ায় এ সমস্যাকে আরও প্রকট করিয়াছে। এতদ্‌সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কাপ্তাই বাঁধের ফলে উদ্ভূত উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধানে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও যে অবস্থা দেখা যায় তাহাকে যথার্থ পূনর্বাসন কোনক্রমেই বলা যায় না। ইহার ফলশ্রুতি স্বরূপ জীবন ও জীবিকার অন্বেষায় বিগত দশকে উপজাতীয়গণের একটি বৃহৎ জনসংখ্যা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত ও বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় হইতে বাধ্য হইয়াছে। উপরন্ত সাম্প্রতিককালে আরও আশংকার কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে অতিরিক্ত (৮১) একাশিটি মৌজায় বনীকরণ প্রকল্প।

উপরোক্ত কারণাদির ফলে কৃষিযোগ্য ভূমির উপর চাপ সৃষ্টি হইয়া যে সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে আরও উৎকট করিয়া তুলিয়াছে পাশ্ববতী জেলা সমূহ হইতে আগত ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিবিধ উপায়ে জমিজমা আত্মসাৎ এর ঘটনা।

বৃটিশ শাসনামল হইতে উপজাতীয় অনগ্রসরতা এবং দুর্বলতার কারণে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পাহাড়ী অধিবাসী ব্যতীত কাহারো নিকট জমি বন্দোবস্ত অথবা হস্তান্তর করার নিষেধ প্রথা প্রচলিত ছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভাগোত্তর কাল হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির এই ধারা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন যন্ত্রের দুর্বলতা অথবা ইচ্ছাকৃত অবহেলার দরুণ এই ধারা কোন কালেই প্রযুক্ত হয় নাই। ইহার ফলে স্বল্প কালের মধ্যেই ইতিপূর্বে উপজাতীয় অধ্যুষিত ফেনী উপত্যকার বিরাট ভাগ হইতে উপজাতীয়গণ সম্পূর্ণ বিতাড়িত হইয়াছে এবং বান্দরবন ও অন্যান্য অঞ্চলের উর্বর নদী অববাহিকা সমূহ বহিরাগতগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। প্রতিকারে অসমর্থ অসহায় উপজাতীয় জনগণ আশঙ্খায় কন্টকিত হইয়া কেবল ভাবিতেছে তবে কি আমরা সমূলে উৎপাটিত হইয়া অন্যত্র নিক্ষিপ্ত হইব?

প্রতিটি পার্বত্যবাসী মনে করে বাংলা আমার মা। বাঙ্গালী আমার ভাই। আমি বাংলামায়ের কনিষ্ঠ সন্তান। তাই প্রতিটি পর্বতবাসী ইহাও মনে করে গিরিমেখলা পার্বত্য চট্টলা তাহার মাতৃস্তন্য স্বরূপ। সমগ্র মাতৃদেহের প্রাণরসে পুষ্ট হইলেও মাতৃস্তনই শিশুর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। স্তন্যপান রত শিশু সহোদরকেও মাতৃস্তন্য স্পর্শ করিতে দিতে রাজী নহে। জ্যেষ্ঠ বলিয়া তোমার বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, তুমি কাড়িয়া নিতে পার কিন্তু আমার মাতৃস্তন্য কাহাকেও ধরিতে দিতে আমার ইচ্ছা নাই ইহাই আমাদের শেষ কথা। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমূহের মধ্যে বর্তমানে ইহাই প্রধানতম সমস্যা বলিয়া আমরা মনে করি।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি!

উপরোক্ত সমস্যা যদি আদৌ কোন সমস্যা বলিয়া আপনার মনে হয় তবে তার একমাত্র সমাধান হইবে নিম্নরূপ:-

ক) এই সব বেআইনী অনুপ্রবেশকারীর স্রোতধারা অবিলম্বে নিশ্চিতরূপে রুদ্ধ করিতে হইবে।

খ) উপযুক্ত তদন্তপূর্বক এযাবৎকাল পর্যন্ত বেআইনীভাবে বন্দোবস্তীকৃত, হস্তান্তরিত এবং দখলীকৃত জমি হইতে বহিরাগতগণকে উচ্ছেদ করিতে হইবে।

গ) চির প্রচলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি প্রশাসন সম্বন্ধীয় বিধি এবং উপবিধিসমূহ কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

এতদসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও কতিপয় প্রস্তাব নিবেদিত হইল:-

ক) সংরক্ষিত বনাঞ্চলের যাবতীয় কৃষিযোগ্য ভূমি বন্দোবস্ত দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

খ) কাপ্তাই হ্রদের জলসীমার উচ্চতা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই ন্যূনতম সীমায় আনার ব্যবস্থা করা হোক।

গ) এবং আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থায় রাখার ব্যবস্থা করা হোক।

ঘ) পদ্ধতিগত জটিলতা পরিহার করিয়া স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী কৃষিঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করা হোক।

ঙ) মারিশ্যা এলাকার নবপ্রতিষ্ঠিত বসতি এলাকায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপন করা হোক।

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ নিবেদিত হইল।

ক) রাঙ্গামাটি হইতে মহালছড়ি হইয়া খাগড়াছড়ি পর্যন্ত সর্ব ঋতুতে ব্যবহার্য পাকা সড়ক তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হোক।

খ) অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি হইতে চন্দ্রঘোনা হইয়া বান্দরবন পর্যন্ত অন্য একটি পাকা সড়ক নির্মাণ করা হোক।

গ) খাগড়াছড়ি মহকুমার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ২টি সড়ক যথা:- খাগড়াছড়ি হইতে পানছড়ি ও খাগড়াছড়ি হইতে দীঘিনালা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করা হোক।

ঘ) বাঘাইছড়ি থানার অন্তর্গত নতুন বসতি এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হোক।

কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনে এই জেলার জনগণের আত্মদানের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় জেলার সীমান্তবর্তী চন্দ্রঘোনা সহ কিছু এলাকা এবং রাঙ্গামাটি ব্যতীত জেলার অন্য কোথাও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা অল্প ব্যয়েই সম্পন্ন হইতে পারে। নিবেদন এই, অচিরে খাগড়াছড়িতে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা নেওয়া হউক।

জলসেচের সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রধান সমস্যা। কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক বহনযোগ্য পাওয়ার পাম্প স্বল্প ভাড়ায় সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইলে ইরি/বোরো মৌসুম ছাড়াও রবি মৌসুমে এগুলি ব্যবহার করিয়া কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব। এতদ্‌সঙ্গে একই পদ্ধতিতে পাওয়ার টিলার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইলেও কৃষি উন্নয়ণের সম্ভাবনা দ্বিগুনিত হইবে। অতএব যথাশীঘ্র উপরোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব নিবেদিত হইল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রস্তাবাবলী যে শেষ এবং সম্পূর্ণ নহে ইহা সহজেই বোধগম্য। তাই আমরা মনে করি উন্নয়ণের গতিকে ত্বরান্বিত করিয়া ইহাকে সক্রিয় রাখিবার জন্য একটি স্থায়ী উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় যাহার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ণ প্রকল্প পরীক্ষা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি!

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে উন্নয়ন সম্ভব এবং সার্থক হয় তখনই যখন তাহার লক্ষ্য হয় কল্যাণধর্মী, পরিবেশ থাকে শান্ত এবং সুশৃংখল। পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, অসন্তোষ অথবা আস্থাহীনতা যদি পরিবেশকে দূষিত করিয়া রাখে তবে উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়, প্রয়াস স্তিমিত হয়।

স্বাধীনতা উত্তরকাল হইতে প্রশাসনিক অব্যবস্থার দরুণ হোক, স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তের ফলে হোক অথবা নেতৃবর্গের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই হোক এই অঞ্চলের সামগ্রিক পরিমন্ডল এমন কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে যে, জনগণের মন আশঙ্কায় আড়ষ্ট হইয়া আছে, স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য নিথর হইয়া পড়িয়াছে। রক্ষণের নামে ভক্ষণের যে প্রক্রিয়া চলিতেছে, শান্তিরক্ষার নামে অশান্তির যে বীজ বপন করা হইতেছে, সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নামে

বিদ্বেষের যে দাবানল প্রজ্বলিত করা হইতেছে সে সবের ফলশ্রুতি হিসাবে জনচিত্তে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দানা বাঁধিয়া বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু সেই তিক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া এই মহতী সম্মেলনের মাহাত্ম ক্ষুন্ন করিবার ইচ্ছা জাগেনা। তাই যথাসময়ে যথাস্থানে, সবিস্তারে সদাশয় সরকারের গোচরে এইসব অভিযোগ উত্থাপন করিবার আকুতি জানাইয়া নিবেদন করিতেছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাদি অনুধাবন করিয়া এ সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের নিমিত্ত অবিলম্বে একটি অনুধাবন কমিটি প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

প্রসঙ্গত ইহাও উল্লেখ কারা যাইতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনামলে এবং উপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসনামলে পর্যন্ত অধিবাসিগণের স্বতন্ত্র জীবনধারা ও ইতিহাস বিবেচনায় জেলাকে Excluded area হিসাবে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছিল অথচ স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে কোথাও এই বিশেষ মর্যাদার উল্লেখ পর্যন্ত না থাকায় এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের ফলে জনগণের মনে একটি স্বাভাবিক ক্ষোভ ও হতাশার সঞ্চার হইয়াছে।

এ সমস্যা জটিল এবং সুদূর বিস্তৃত, ইহার সমাধানও সহজ নহে এই সত্য স্বীকার করিয়া এবং সর্বপ্রকার অভিমান ও ভাবাবেগ বর্জন করিয়া এই সমস্যার সমায়ানুচিত এবং তাৎক্ষনিক প্রতিকার হিসাবে অদ্যকার সম্মিলিত জনগণের এই অভিমত যে প্রস্তাবিত অনুধাবন কমিটি কর্তৃক সমস্যা নির্ধারণ এবং জনগণের ইচ্ছা ও আশা আকাঙ্ক্ষা যাচাই করার পরে যথাসময়ে পূর্ণ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমাধান সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে গুরুতর কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ব্যতিরেকেই নিম্নোক্ত প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমেই জনগণের আস্থা অর্জন করা যাইতে পারে।

ক) উপজাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশাসন কার্য্যে জেলা প্রশাসনকে সাহায্য ও উপদেশ দানের জন্য উপজাতীয় জনপ্রতিনিধিগণের সমবায় গঠিত একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করা হউক।

খ) বর্তমান পুলিশ প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করিয়া বর্তমান পুলিশ বাহিনীর স্থলে পূর্বতন পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনীর অনুরূপ প্রধানতঃ এই জেলার উপজাতীয় লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা হউক।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি!

পার্বত্য চট্টগামের অনুগত উপজাতীয় জনগণ দেশের সংখ্যাগুরু সমতলবাসী ভ্রাতাগণের সঙ্গে সমতালে পা ফেলিয়া দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের উৎসগীকৃত করিতে সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু জন্মলগ্নে তাহারা পঙ্গু এবং দুর্বল বলিয়া দেশমাতার কনিষ্ঠ সন্তান হিসাবে বিশেষ স্নেহ এবং মমতালাভের দাবী রাখে। পরিশেষে দেশমাতৃকার হে বরেণ্য সন্তান আমরা আপনার সমৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া এবারের মত অবসর লইতেছি।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ!

তারিখ - রাঙামাটি
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫ইং

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুগত উপজাতীয় জনগণের পক্ষে -

১) চারু বিকাশ চাক্‌মা, ২) খুলারাম চাক্‌মা, ৩) বিনয় কুমার দেওয়ান, ৪) অশোক কুমার দেওয়ান, ৫) সুকুমার দেওয়ান, ৬) নীহারবিন্দু চাক্‌মা, ৭) সুধীর কুমার চাক্‌মা, ৮) অনিল বিহারী চাক্‌মা, হেডম্যান, ৯) হীরালাল চাক্‌মা, চেয়ারম্যান, ১০) শশাঙ্ক মোহন চাক্‌মা, হেডম্যান, ১১) তিলক চন্দ্র চাক্‌মা, হেডম্যান, মৌজা বেতছড়ী, ১২) মতিলাল চাক্‌মা, হেডম্যান, ১৩) মৃদুলকান্তি দেওয়ান, হেডম্যান, ১৪) কিশোরী মোহন তালুকদার, হেডম্যান, ১৫) কিরণ বিকাশ চাক্‌মা, চেয়ারম্যান, ১৬) যামিনী রঞ্জন চাক্‌মা, রাঙ্গামাটি, ১৭) ভুষণ চন্দ্র চাক্‌মা, মেম্বার, ১৮) রেবতী প্রসাদ চাক্‌মা, প্রধান শিক্ষক, ১৯) সঞ্জীব চন্দ্র দেওয়ান, চেয়ারম্যান বুড়ীঘাট, ২০) পুলিন বিহারী তালুকদার, হেডম্যান, ২১) অরিন্দম দেওয়ান, হেডম্যান, জুড়ছড়ী, ২২) কালী শঙ্কর দেওয়ান, সহকারী হেডম্যান, মগবান মৌজা, ২৩) অস্পষ্ঠ, ২৪) অস্পষ্ঠ, ২৫) হরিপদ চাক্‌মা, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ২৬) জৌতির্ময় চাক্‌মা, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ২৭) বিমল চন্দ্র চাক্‌মা, ২৮) কিষ্টচান চাক্‌মা, সদস্য লংগদু, ২৯) জলন্তমণি চাক্‌মা, ৩০) শশীমোহন কাব্বারী, ৩১) শচীনাথ চাক্‌মা, চেয়ারম্যান, লংগদু, ৩২) অপর্ণা চরণ চাক্‌মা, সহসভাপতি, ১ নং লংগদু ইউনিয়ন, ৩৩) জ্ঞানশংকর চাক্‌মা, চেয়ারম্যান, খেদারমারা, ৩৪) উষাময় দেওয়ান, হেডম্যান ৩৭৬ নং তিনটিলা মৌজা, ৩৫) জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাক্‌মা, ৭০ নং হাজাছড়ী মৌজা, ৩৬) লাল বিহারী চাক্‌মা, হেডম্যান, ৩৭) সুশান্ত কুমার চাং , হেডম্যান, ৩৮) নরহরি কার্ব্বারী, হেডম্যান, ৩৯) কৃষ্ণ চাক্‌মা, হেডম্যান, ৪০) দ্রোণ কুমার কার্ব্বারী, হেডম্যান ৪১) অপর্ণা চরণ চাক্‌মা, চেয়ারম্যান, বরকল ইউ, পি, ৪২) দেবেন্দ্র লাল কার্ব্বারী, ভাইস-চেয়ারম্যান, বরকল ইউ, পি, ৪৩) করুনা মোহন চাক্‌মা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুগত উপজাতীয় জনগণের পক্ষে -ভূষণছড়া ইউ, পি, ৪৪) L. Chhawnsanga, Chairman Sajak,45) অস্পষ্ঠ, ৪৬) অস্পষ্ঠ, ৪৭) ভাগাধন চাক্‌মা, ৪৮) অস্পষ্ঠ, ৪৯) মংসাজাই চৌধুরী, হেডম্যান, ৫০) গোপাল কৃষ্ণ দেওয়ান, চেয়ারম্যান, ৫১) যামিনী চাক্‌মা, ৫২) নুতন চন্দ্র, হেডম্যান, ৫৩) পুলিন বিহারী তালুকদার, ৫৪) বসুন্ধরা দেওয়ান, ৫৫) চিরঞ্জীব রায়, হেডম্যান, বালুখালী, ৫৬) দয়া ভূষণ ত্রিপুরা, ৫৭) অনন্ত বিহারী খীসা, ৫৮) সুবিমল দেওয়ান, ৫৯) মংফ্র সাইন (মং চীফ), ৬০) মং শৈ প্রু চৌথুরী, (বোমাং চীফ), ৬১) বিরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা প্রাক্তন এম, পি, এ, ৬২) নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, ৬৩) এ, কে, দেওয়ান, চেয়ারম্যান, পৌরসভা, ৬৪) মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ান, ৬৫) কোকনদক্ষ রায়, ৬৬) কুমার সমিত রায়, ৬৭) জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাক্‌মা, অধ্যক্ষ, রাঙ্গামাটি নৈশ মহাবিদ্যালয়।

চাকমা দর্পণ ঃ যামিনী রঞ্জন চাকমা

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় রাজনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে আরাকান থেকে চাকমা রাজ পরিবারের তৈনসুরেশ্বরী নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির অধিনায়কত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের আলীকদম নামক স্থানে চাকমারা আগমন করে। তখনকার সময়ে চাকমা জনসংখ্যা খুব কম ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের নরপতির অধিনায়কত্বেই সদলবলে বিচরণ করতো। তারা আবার নরপতির অধীনে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করতো। অবশ্য প্রতিটি ছোট দলে এক একজন দলপতি থাকতো। এইভাবে তাদের পরিচিতি পেতো কে কোন দলের বা কার দলের লোক হিসাবে। তখন বড় দলের লোকজন তাদের দলপতির নামে গোছা ও ছোটদলের লোকজন গোষ্ঠী বলে পরিচিতি পেতো। কোন কোন সময় বিশেষ লোকের নামানুসারে কাম্ভে গোছা। কাম্ভে নামক একজন লোকের নামানুসারে কাম্ভে গোছা এবং চার পুত্রের নামে চারটি গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছিল। এইভাবে বিভিন্ন গোছা ও গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে। আপাততঃ বহু চেষ্টায় ৩৪টি গোছার সন্ধান পাওয়া গেছে।

নিম্নে সেসব বিবরণ দেওয়া গেলঃ

গোছা	গোষ্ঠী
১। আঙু	১। মগ, ইহ্লিয়া
২। উস্সুরী	২। তিবিরিয়া
৩। ওয়াংসা	৩। কালাকাঙারা, রাঙাকাঙারা
৪। কাম্ভে (বড়)	৪। দ্যায়া, অংগ্য, হ্লাধিএগা।
৫। কাম্ভে (গুড়)	৫। মেন্দর, মানেয়া, গজাল্যা।
৬। কুদুগ'	৬। সর্দার।
৭। কুরকুট্যা/কুরকুজ্যা	৭। নেন্দার, অঙরে, নন্দদেব, পীড়াভাঙ্গা, ফিরিয়াংজা, ভবা, নারান, লরকস্যা, সাঙজআনা, তাদেগা, সুরসুরি, সাউদা, পচা আগুনপুন, পেজার, সর্দার, ডঙ্যা, হ্লাধিএগা, রাজাকাবা, উগুরেং।
৮। খ্যাংজয়/খ্যাংজে	৮। চৈয়দনী, দোয়াজা, নাপিতা সেহ্ম, চকই, বাঙালী, কবালা, তিবিরিয়া।
৯। চাদঙঅ	৯। সর্দাযা্য (বড়) রুয়াসিরা, সাত্তঙ্যা, গুড় সর্দায্যা বা কুরপাগালা।
১০। [illegible] পাঅ	১০। ধুর্যা, মেন্দর, চায্যা, বগা, বোয়া, খেহ্লঅ।

গোছা	গোষ্ঠী
১১। চেগে (দুখ্যা)	১১। কাঙারা, বগিলা, ভুলং, ভুরুঙঅ, মিনাঙ্যা, ধামালা, পীড়াভাঙা, আহ্গারা।
১২। তেইয়া	১২। পুইজগা, ফাদেঙা।
১৩। তৈন্যা	১৩। কুজ্যা, উর্যা, ধাম্মুয়া, মলিয়া, মেন্দর।
১৪। দার্যা	১৪। নাদুকতুয়া, কঙরে, কলা।
১৫। ধাবেঙঅ	১৫। পীড়াভাঙা।
১৬। ধামেই/ধামাই	১৬। তদেগা, সুরসুরি, ঘরকাবা, (মগ), বোয়ের কাবা, রাগকাবা, রাজ্জোকাবা, চার্য্যা (মাঝ্যাং) কাংকঙঅ, মাহ্গারা, মত্য, চাদঙঅ, লোহ-পাট্টুয়া।
১৭। পুওয়া	১৭। কজরা, ফাতুয়া, লাংদা কক্কেংঙ্যা
১৮। পু-ঙঅ	১৮। ঝান্দা।
১৯। পেদাংছড়ি তৈন্যা	১৯। বামনঅ (বাঙোনঅ)।
২০। পেমা/ফেমা	২০। তিবিয়া।
২১। ফাকসা (বড়) ফাকসা (গুড়) কবালা, লুকেয়া।	২১। দুয্যা/দুয্যা।
২২। বগা	২২। ধুর্য্যা, কাহ্তুয়া, রেঙাল, নেই-নাঙ্যা।
২৩। বংসা	২৩। চগদা, মোকচড়া, চেহ্ত্যা।
২৪। বর্চেগে	২৪। উন্দুরতালা, আসাচূলঅ, কুমুজ, হাইত্যাল, গজাল।
২৫। বর্বুয়া	২৫। ফেজেরা, পাগালা, তবা, ফরা, রণপাগালা, ভেদুলী, নাদুকতুক্ কাংসুরী, বাদালী, দজা, কবা, ভুদ, বিলেইগু, ভহ্দ, কার্বুয়া, পুওয়া-নামজা, মগ, বেঙঅ, সেহ্ম, আগুনিপুন, কাঙারা, (কুমুজঅ) তবা।
২৬। বাবুরো	২৬। বাউরা, গজাল্যা, মানেয়া লৌহপাট্টুয়া।
২৭। বুঙঅ	২৭। রুমসা, বাউজ রুঅজ, লেনাংঙা।
২৮। মুহ্লিমা	২৮। ধাবানা, ছোল্যা, বাদালী, কলা, সিংহ, পচা, কার্বুয়া, শেরপার্য্যা, রাঙাসিলুম্যা, মিধা, মানেয়া, অনিন্দ্যা, মগ।
২৯। মুহলিমাচেগে	২৯। সুখরা।

গোছা	গোষ্ঠী
৩০। রাঙী/রাঙে	৩০। মেন্দর, চেগ, ভোঙেয়া, কাহ্লঅ, ভারাল্যা, রেঙাল।
৩১। লকসর	৩১। গজাল, বংজা, ভেদুলী।
৩২। লাম্‌মা/লার্মা	৩২। পীড়াভাঙা, বড়চায্যা, মাঝ্যাং, চায্যা, চিকন চায্যা, সাত-ভেইয়া, তদেগা, রাজাকাবা, আগুনপুন, বগা।
৩৩। লেবা	৩৩। লৌহপাট্টুয়া, সুক্‌ক/সুক্‌কু, উদচেহ্‌দ/উবুদচেহদ।
৩৪। হিয়া/হেয়	৩৪। জানা গেলোনা।

সূত্র ঃ চাকমা দর্পণ, বাবু যামিনী রঞ্জন চাকমা।

"শ্রী শ্রী ভোক্ত ফড়া
বিজ্ঞাপণ"

"সর্ব সাধারণের অবগতার্থে এ বিজ্ঞাপণ প্রচার করিতেছি যে, অত্র চট্টগ্রামস্থ পর্বতাধিপতি আদী রাজা শের মস্ত খাঁ, তৎপর রাজা শুকদের রায়, অতঃপর রাজা সের দৌলত খাঁ, পরে রাজা জান বকশ খাঁ, অপরে রাজা তব্বার খাঁ, অনন্তর রাজা জব্বার খাঁ, আর্য্য পুত্র রাজা ধরম বকশ খাঁ, তৎসহধর্মিণী আমি শ্রীমতি কালিন্দি রাণী আপন অদৃষ্ট সাধনাভিলাষে তাহানদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাত নমস্কার প্রদান করিলাম। মদীয় পূর্ববর্তীর ধর্মার্থে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য দ্বিগ্‌দেশীয় অনেকানেক ফুঙ্গিগণ কর্তৃক শাস্ত্রানুসারে ১২৭৬ বাঙ্গালার ৮ই চৈত্র দিবসে অত্র রাজানগর মোকামে, সুমঙ্গলা রত্নাকর চিঙ্গ সংস্থাপন হইয়াছে। তাহাতে আজন্মাবধি বিনা করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ঠাকুর হইতে পারিবেক। উল্লেখিত পূণ্যক্ষেত্রের দক্ষিণাংশে শ্রী শ্রী চাক্য মুনি স্থাপিত হইয়া তদুপলক্ষে প্রত্যেক সনাখেরিতে মহাবিষুর সময় যে সমারোহ হইয়া থাকে ঐ সমারোহেতে ক্রয় বিক্রয় করণার্থে যে সমস্ত দোকান ও বেপারী আগমন করে ও মঙ্গলময় মুনি দর্শণে যে সমস্ত যাত্রিক উপনীত হয়,তারা দিগ হইতে কোনেক প্রকারের মাসুল অর্থাৎ কর গ্রহণ করা যাইবে না। ইদানিক কি ভবিষ্যতে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ হইতে ইহা লঙ্ঘণ করিয়া কর গ্রহণ করি ও করাই কি করে বা করায় তবে এই জন্মে ঐ জন্মে এবং জন্মে জন্মে মহাপাতকি পাত্রে পরিগণিত হইবে।"

'কিমাধিক মিতি' ঃ (শ্রীমতি কালিন্দি রানী)

"রাণী কালিন্দি"

"ইনি মহারাজ ধরম বখশ খাঁর পাটরাণী। গুজাং দেওয়ান কালিন্দি রাণীর পিতা এবং কুরাকুট্যা সম্ভুত ছিলেন। ১৮৩২ খ্রীঃ (১১৯৪ মঘী/১২২৯ বাঙ্গালা) ধরম বখশ খাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৪৪ খ্রীঃ (১২০৬ মগী/১২৫১ বাঙ্গালা) চাকমা রাজ্য শাসন করার ভার বৃটিশ গভর্নমেন্ট রাণীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি এই প্রকার ন্যায় ও দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করেন যে, চট্টগ্রামের সর্বত্র চিরকাল তাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছে। প্রথমে হিন্দু ধর্মে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিলো। পরে বৌদ্ধ ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং ১৮৬৯ খ্রীঃ (১২৩১ মগী/১২৭৬ বাঙ্গালা) ৮ই চৈত্র দিবসে রাণী কালিন্দি রাজা নগর রাজবাড়িতে পবিত্র চিঙ্গ (সীমা) স্থাপন এবং মহামুনি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। এই মূর্তির সম্মুখে চৈত্র শেষে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের সংমিশ্রিত যে বাৎসরিক বিরাট মেলা বসিয়া থাকে, ইহা তাহারই কীর্তিস্তম্ভ। ইহার রাজত্বকালে বৃটিশ গভর্নমেন্ট প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন। তিনি অতিশয় তেজোস্বিনী ও মেধাবিণী ছিলেন এবং স্বীয় কুল গৌরব ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজপুত মহিলাদের ন্যায় তাঁহার নিকট রাজ্যাপেক্ষা এমন কি প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলো। এই কারণে তৎকালিন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন লুইন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। তাহাতে লুইন রাণীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হোন এবং চাকমা রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত করিয়া যান। মান রাজার রাজ্যসৃষ্টি, বিশাল রিজার্ভ গঠন, কর্ণফুলী নদীর বহু আয়কর টেক্স ঘাট, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক খাসকরণ ইত্যাদি ক্যাপ্টেন লুইনের প্রতিহিংসার কার্য। রাণী কালিন্দির ১৮৭৩ খ্রীঃ (১২৩৫ মগী/১২৮০ বাঙ্গালা) ৫ই আশ্বিন তারিখে বাত রোগে রাজা নগর রাজপ্রাসাদে স্বর্গারোহণ হয়। ইতি।

১লা জানুয়ারী ১৯১০ ইং — লেখক শ্রী ভুবন মোহন রায়

১৭ই পৌষ ১২৭১ মগী — চাকমা রাজা

২৪৫৩ বুদ্ধাব্দ ১৩১৬ বাঙ্গালা"

কতিপয় তথ্য উপাদানঃ

(ক) লোকগীতি : রাধা মোহন ধনপতির পালা।

চাকমা ভাষ্য ঃ

'নাজের উল্লাজে রাধামন,

খৈ-গাঙে পল্লাক গি সৈন্যগণ।

কোচি রান্ন্যা কাদা বন,

জয় নারান ইদু গেল রাধামন।

ইজরত নিগলি চান ন চান,

দ্বিসত তেঙ্গা দিলেও তিবিরা

হ্যাম ন খান।

জালি পাগজ্যা লুঙ্গিলাক,

সিধু ছৈন্যগণ জিরেলাক।

জাদি পুজাত তে ঘি দিল,

খিয়াং রেজ্য জিদি নিল।

এবে জিদিল কাঞ্চন দেজ,

উল্লা ফিরি যেই পুগর দেজ।

পুগর রেজ্য কালিঞ্জর,

সিমিখ্যা রাধামন দিলো লর।

কালিঞ্জর রাজা গি গরলো,

পাথরী কিল্লা যোগাল্লো।

যুদ্ধত জিদি বাললো তেজ,

সিত্তুন গেলো অকসা দেজ।

তৌনে রানি নি ভাত খেলাক,

সমুন্দর ছাগর নি লাগপেলাক।

সৈ নেই সমারে ছৈন্য গণ,

রোয়াং কলে লুঙ্গে গৈ রাধামন।

গাজো আগাদ তাগেদ ফুল,

লুম্বেগৈ রাধামন সাপ্রেই কূল।

[illegible] বাজিল [illegible] রাজা,

মগ রাজা [illegible] এলো [illegible] রাজা।

রাধামনর ছাস ডাঙর,

আস্তে আস্তে মগ রেজ্যা মারিলর।

মগে গত্তন হাহাগার,

চাঙমায় গত্তন মগরে অনাচার।

কোয় মগ রাজা রাধারে,

রেজ্যা গজেই দেঙগর তোয়ারে।

গয়া গঙা গরলুং দান,

চাঙে তোত্তন পরাণ নান।'

বাংলাঃ

নাচছে উল্লাসে রাধামন,

খোয়াই গাঙে পড়লো গিয়ে সৈন্যগণ।

কচি বিরান কাঁটা বন,

জয় নারায়ণের ওখানে গেলো রাধামন

মাচায় নিকলে চায় না চায়,

দ্বিশত টাকা দিলেও ত্রিপুরা

হাঁ না যায়।

জালি পাগজ্যা পৌছে গেলে,

ওখানে সৈন্যরা জিরিয়ে নিলে।

জাতি পূজায় ঘি দিলে,

খিয়াং রাজা জিতে নিলে।

এখন জিতিল কাঞ্চন দেশ,

উল্টা ফিরে যায় পূবের দেশ।

পূবের রাজা কালিঞ্জর,

সেদিকে রাধামন দিলো নড়।

কালিঞ্জর রাজা কি করলো,

পাথরী কিল্লা যোগাড়লো্

যুদ্ধে জিতে বাড়লো তেজ,

সেখান থেকে গেলো অকসা দেশ।

তরকারী রেঁধে ভাত খেলে

সমুদ্র সাগর নাগাল পেলে।

সঙ্গে নিয়ে সৈন্যগণ,

রোয়াং কূলে পৌছে গেল রাধামন্।

, গাছের আগে ফুটন্ত ফুল

পৌছে গেল রাধামন সাপ্রেই কুল।

বড়শিতে বিধছে ধলা বাচা,

মগ রাজা কয় এলো কোন রাজা।

রাধা মোহনের সাহস বাড়ে,

আস্তে আস্তে মগ রাজ্য জয় করে।

মগেরা করছে হাহাকার,

চাকমারা করছে অনাচার।

কয় মগ রাজা রাধারে,

রাজ্য গছিয়ে দিচ্ছি আপনারে।

গয়া গঙ্গা করলাম দান

চাই আপনার কাছে পরাণ খান।

গ) রাণী কালিন্দি প্রদত্ত পাট্টা

'পাট্টা কবুল করার দাদে বকবুলিয়ত শ্রীঈশান চন্দ্র দেওয়ান পিছরে লবণ খাঁ দেওয়ান মৃত, সাকিন কাচালং জোম বঙ্গ, থানে কাচালং প্রতি, কামি দামি ইস্তিমেরারি তালুকি পাট্টা পত্রমিদং আগে আমার জমিদারীর অধীন কার্পাস মহাল সংক্রান্ত তোমরা সাবেক মুরচি তালুকদার মোট পাক্কা (১) ১১ ঘরের কাতে কাঁচা ১৭৩ ঘর রায়তের সালিয়ানা হস্তবুদ মবলক ১১২। ১০ গন্ডা, কোম্পানী বেশী ৭/৬ গন্ডা, পুন্যাহ নজর ১ টাকা, চিনার খরচা ১ টাকা, আগচলি ৫ টাকা, হদিশ আন ৪ টাকা, সাকুল্যে মং ১৩০ দ/১৬ গন্ডা, বাদস্বরূপ ২দ/০ বাকিস্থিত ১২৮/১৬ গন্ডা, খাজনার পরে তুমি তালুকী পাট্টা পাওয়ার দরখাস্ত করায় তাহা মঞ্জুরক্রমে তোমা হইতে কামি দামি ইস্তমিরামী তালুকী কবুলিয়ত লইয়া, কামি দামি ইস্তমিরারী তালুকী পাট্টা দিতেছি যে, নিরূপিত খাজনা, বাজে রকমসহ সন বসন তুমি ও তোমার পুত্র পুত্রাদি ক্রমে নীচের লিখিত কিস্তিমতে, চালান সম্বলিত আমার জমিদারী সেরেস্তাতে দাখিল করি দিয়া দাখিলা লইবা ও লইবেক। শটামিতে কিস্তিমতে খাজনা আদায় নাকরে ওনা করায় প্রচলিত কানুন জারিতে ও আগমস্য যাহা কানুন প্রচলিত হয়, তদ্বারাহ খাজনা গয়রো তোমার মাল মনকুলা স্থাবর সম্পদাদি ক্রোরক ও নিলাম বিক্রিপূর্বক আদায় লইতে কোন ওজর না করিবা,ও না করিবেক। ভেটবেগার নজর স্বীকার খাইন মাখট রসদ খর পটন খরচাও সাদি ক্রিয়াতে নজরানা ও খরচা পূর্ব মতে ও যখন যাহা উপস্থিত হয়, এবং হুজুরের অঙ্ক বেশী হয়, সব তালুকদারান সে মতে দিবা ও দিবেক। তালকা হেবা খারিজ আমার হুকুম বিনা না করিবা। বেআইনী কোন কর্ম না করিবা। তোমরা নিজে নিশা করিয়া তালুকাতে কোন ফৌজদারী মকর্দমা উপস্থিত হয়, তৎশীগ্রহ হুজুরে অথবা আমার নিকট এতেলা করিবা। তালুকায় রায়ত উৎবৃদ্ধ হয়, নিরূপিত জমামতে তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারান ভোগবান থাকিবা ও থাকিবেক। রায়ত ফতেফেরাল হয় বা খাজানা আদায়ের পক্ষে কোন ওজর না করিবা ও করিবেক। জব্দ জরীপে আমার মালিকিতে তোমার তালুকা ধরাইবা। তালুকার রায়ান রানা রানী খিসা সাবেক মতে দখলে রাখিবা। এতদর্থে কামি দামি ইস্তি মিরারী তালুকার পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৩১ মং তারিখ ২ আষাঢ়-'

(স্বাক্ষর)

শ্রীমতি কালিন্দি রাণী

চাকমাদের শতাব্দী প্রাচীন জনসংখ্যা ঃ

কমিশনার বাহাদুরের চিঠি নং ৫৬৫ তাং ৩-৬-১৮৮১ মূলে তখনকার চাকমা জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিলো ঃ

রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের সার্কেলভুক্ত করদাতা

চাকমা জুমিয়া	৫০১১ পরিবার
মাং সার্কেলভুক্ত চাকমা	১০৫৮ পরিবার
নিষ্কর ১৫% হিং	৯১০ পরিবার
স্বাধীন বন্দোবস্তি প্রাপ্ত চাকমা	১২৬৫ পরিবার

মোট ঃ ৮২৪৪ পরিবার

পরিবার প্রতি ৫ জন হিসাবে মোট ৪১২২০ জন চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা সহ এই হিসাব সামগ্রিক।

পার্বত্য আইন ঃ তত্ত্বে ও প্রয়োগে : ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রতিম রায় পাম্পু এডভোকেট

প্রকৃত পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতীত কাহিনী এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, এবং রহস্য ঘেরা। পাহাড়ী জাতিসত্তাসমূহ সুদূর অতীতের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চলে আগমন করেছে। বাংলাদেশের মূল জনজীবন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলে দশ ভাষাভাষি ১২টি পাহাড়ী আদিবাসী জাতিসত্তা বাস করে। ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবন ধারায় অভ্যস্ত এই জাতিসত্তাসমূহ দীর্ঘদিন যাবত একই অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করার মধ্য দিয়ে তাদের মাঝে গড়ে তুলেছে একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক আবহ। আবার এটা লক্ষ্যণীয় যে, তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী, গোষ্ঠি নির্বিশেষে তাদের মধ্যে যে সব সাদৃশ্য রয়েছে তাহলো (১) নৃতাত্ত্বিক বিচারে সবাই সাধারণভাবে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভুক্ত (২) সাংস্কৃতিক পটভূমি এক ও অভিন্ন (৩) তাদের জীবন দর্শন এবং জীবিকার প্রয়োগ ও পদ্ধতি এক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ী আদিবাসী জনগোষ্ঠির অবস্থান সর্ম্পকে প্রথম জানা যায়- JOAO DE BARROS নামক জনৈক পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ১৫৫০ সালের দিকে DESCRIPCO DE REINO DE BENGALA নামক যে মানচিত্রটি আঁকেন তাতে কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীরে CHACOMAS Hhw REINO DE TIPORA নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (The map of JOAO DE BARROS dated 1550 A.D- Dr. Abdul Karim, J A.S.P(1963) VOL-V111 NO-2) ১৭১৫ সাল থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত মোগল শাসনামলে এবং ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসনামলে এই অঞ্চলটি রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল পত্রে 'কার্পাস মহল' নামে পরিচিত ছিল'। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসন বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে যাবার আগে এই অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক, বিচার ও শাসন ব্যবস্থা এবং সার্বভৌম ক্ষমতা রাজাদের হাতে ছিল (লেঃ কঃ টমাস এইচ. লুইন- এ ফ্লাই অন দি হুইল পৃষ্ঠা- ২০৬-৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনিকভাবে চট্টগ্রাম জেলারই একটা অংশ ছিল। ১৮৬০ সালের ২০শে জুন নোটিফিকেশান নং-৩৩০২ অনুসারে ১৮৬০ সালের ১লা আগষ্ট রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার ট্রাইব এ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০ অনুসারে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৮৬০ সালের পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজস্ব প্রশাসনের একটি ইউনিট হিসাবে ''কার্পাস মহল'' নামে চট্টগ্রাম কালেক্টরেট-এর অধীনে ছিল। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পর হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ ভারতের সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন এই জেলার দেওয়ানী, ফৌজদারী বিচার কাজ সম্পাদন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য কতিপয় আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করা হয়। আইনগুলি হলো ঃ ১। রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার ট্রাইবস এ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০ ২। এ্যাক্ট 8 (বি.সী) অব ১৮৬৩ ৩। রেগুলেশান ৫ অব ১৮৬৩ ৪। চিটাগাং হিলট্রেক্ট ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশান ১৮৮১। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ইতির্পূবে বলবৎকৃত উপরে বর্ণিত ১ ও ২নং এ্যাক্ট সম্পূর্ণ বাতিল করে নোটিফিকেশান নং -১২৩ পি.ডি, তারিখ-পহেলা মে, ১৯০০ অনুসারে "THE CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION, 1900 (REGULATION NO -1 OF 1900) নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় একটা নতুন আইন চালু করা হয়। বলা যায়, ১৮৬০ সাল হতে শুরু করে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসন সম্পর্কিত যে সব নিয়মাবলী জারী হয়েছিল, তারই সুসংহত কাঠামো ও নীতি নির্ধারিক হল ১৯০০ সালের রেগুলেশান। ১৯০০ সালের C. H. T Regulation ১৯২০ ও ১৯২৫ সালে সংশোধনী আনা হয়। উভয় সংশোধনীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী আদিবাসীজনগণের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে নূতন নীতিমালা সংযোজিত হয়। এই সংশোধনীর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে দ্বৈতশাসন পদ্বতিতে

প্রশাসন ব্যবস্থার একটি 'শাসন বহির্ভূত এলাকা' যা EXCLUDED AREA হিসাবে EXECUTIVE COUNCIL এর সাহায্যে প্রাপ্ত গভর্নরের দায়িত্বে শাসিত এলাকার মর্যাদা দেওয়া হয়। এই বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার কারণে বৃটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পল্লী অঞ্চলে কোন প্রকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়নি। বৃটিশ ভারতে অন্যত্র স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড বা জেলা বোর্ড গঠন করা হয়নি। বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ২রা আগষ্ট তা আইনে পরিণত হয়। এ আইনের মূল লক্ষ্য ছিল গভর্ণর শাসিত প্রদেশসমূহ এবং ফেডারেশনে যোগ দিতে ইচ্ছুক ভারতীয় রাজ্যসমূহের সমন্বয়ে সর্বভারতীয় ফেডারেশন গঠন এবং প্রতিটি গভর্ণর শাসিত প্রদেশে নির্বাচিত আইন সভার কাছে দায়বদ্ধ প্রাদেশিক সরকার গঠন করা। তারই অংশ হিসাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের ১১টি প্রদেশে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তম্মধ্যে বাংলা ছিল অন্যতম। বাংলার ঐ প্রদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কোন আসন বরাদ্দ করা হয়নি এবং পাহাড়ী জনগণকে কোন প্রকার ভোটাধিকারও দেয়া হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৃটিশ আমলে বাংলা কিংবা ভারতের আইন পরিষদে পাশ করা আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসিত হয়নি। শাসিত হয়েছিল বাংলা গভর্ণরের প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে প্রণীত রেগুলেশান অনুসারে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৩১১ নং অনুচ্ছেদের উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকার সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং PART (111) THE GOVERNORS PROVINCES CHAPTERS (v) EXCLUDED AND PARTIALY EXCLUDED AREA অধ্যায়ের ৯১ ও ৯২ অনুচ্ছেদের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের EXCLUDED AREA-এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯০০ সালের রেগুলেশান অনুসারে শাসিত হয়।

ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত করে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছিল মুলতঃ যে সূত্র ধরে, সেই দ্বিজাতি তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যার পঁচানব্বই শতাংশ অমুসলিম, ভাষা ও জাতিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সঙ্গত কারণে ভারতেই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেই সূত্র বরবাদ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি NATIVE STATE হিসাবে স্বীকৃতি দানের জন্য বৃটিশ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতাদের কাছে জোর দাবী জানিয়েছিলো। এসব দাবী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তারা ত্রিপুরা, কুচবিহার ও খাসীয়াদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে একটি কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছিল (পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা এবং বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংকট- জুম বিজয় চাকমা বৈ-সাবি-৯১ হিল ভিউ পৃষ্ঠা-৮) "পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত কেন করা হল, এই নিয়ে ভারত বিশারদ ও ইতিহাস বিশারদদের মতের ভিন্নতা রয়েছে । কারো মতে, পূর্বাঞ্চলের খুলনা, সিলেট ও কলকাতা কার ভাগে যাবে - এই নিয়ে পুরস্পর বিরোধী দুটি বৃহৎ দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ব্যস্ত থাকার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি । কেউ কেউ আবার মত প্রকাশ করেন পাঞ্জাব প্রদেশের ফিরোজপুর জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সংগে সংগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল (প্রসঙ্গ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সিদ্বার্থ চাকমা পৃষ্ঠা-৩) তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন-এর বক্তব্য ছিল- বারোস আমাকে ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক জীবন পূর্ব বাংলার উপর নির্ভরশীল। আসামের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা বা দুটো দূর্গম পথ রয়েছে। ফলে পূর্ব বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা সেখানকার জনগণের জন্য দূর্ভোগের কারণ হবে। এখানকার মোট জনসংখ্যা আড়াই লক্ষেরও

কম, প্রায় সবাই উপজাতি, যদি তাদের কোন ধর্ম থেকে থাকে তা হচ্ছে বৌদ্ধ। বাউন্ডারি কমিশনের শর্ত অনুসারে তারা অমুসলিম। আর এক দিক থেকে পূর্ব বাংলার একমাত্র বন্দর চট্টগ্রাম নির্ভরশীল পার্বত্য অঞ্চলের ওপর। আমাকে বলা হয়েছিল পার্বত্য অঞ্চলে বনাঞ্চল ধ্বংস হলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পলি জমবে।

(ল্যারি কলিন্স এ্যান্ড ডমিনিক লাঁ প্যায়ারে, মাউন্ট ব্যাটেন এ্যন্ড দ্যা পার্টিশান, বিকাশ পাবলিশিং, দিল্লী, পৃষ্ঠা ১৭৭/১৭৮।)

এই সমস্ত টানা-পোড়েনের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ই আগস্ট উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল ১৬ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে (Viceroys Personal Reports- Report No-17, August 16, 1947)। পার্বত্য চট্টগ্রামের পকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিতে ক্রুদ্ধ হন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল (মিশন উইথ মাউন্ট ব্যাটেন- এ্যালেন ক্যাম্বেল জনসন পৃষ্ঠা ঃ ১৩৯)। রাজনৈতিক চাপে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। হিন্দু- মুসলমান এলাকা চিহ্নিত করার জন্য তাকে যে সম্মানী দেয়া হয়েছিল, সেই টাকা তিনি গ্রহণ করেননি। জানিয়েছেন নীরব প্রতিবাদ (র‍্যাডক্লিফ সোড চাকমাস রীপ (এ.এন. পন্ডিত- অমৃত বাজার পত্রিকা ১১ই মে, ১৯৮০)। পাকিস্তান ও ভারত, দুটি রাষ্ট্রই নিজেদের স্বার্থে এবং প্রয়োজনে বৃটিশ সরকারের আইন-কানুন বহাল রেখেছিল। বৃটিশ প্যানাল কোড- ভারতীয় প্যানাল কোড ও পাকিস্তান প্যানাল কোডের নাম নিয়েছিল। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশান পাকিস্তান সরকার বলবৎ রাখে। সেই হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে। তবে পকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আঘাত আসে ১৯৪৮ সালে। চিটাগাং হিল ট্র্যাক্ট ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশান ১৮৮১ এর আওতায় বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পাহাড়ী জনগণ থেকে রিক্রুট করে একটি আলাদা পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল। এই পুলিশ বাহিনীর বিশেষ নিয়ম-কানুন ছিল। পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশান ১৮৮১ বিলুপ্ত ঘোষণা করে ১৯৪৮ সালে বিশেষ বাহিনীর ব্যবস্থা উঠিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। এই প্রথম বারের মত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পাহাড়ী জনগণ ভোটাধিকার লাভ করে এবং প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ও জন প্রতিনিধিত্বের সুযোগ লাভ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে- অমুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে ২ জন পাহাড়ী নেতা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয়। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রের IV অধ্যায়ের ২১৮ নং অনুচ্ছেদে বিশেষ এলাকার সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং ২০৪, ২০৫, ২০৬ ও ২০৭ নং অনুচ্ছেদের আওতায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত অনগ্রসর অংশ হিসাবে কাষ্ট, রেইস উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছিল তা বিশেষ অঞ্চলে বহাল রাখা হয়। এ শাসনতন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ জেলার মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। ১৯৬২ সালে ২য় বারের মত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হয়। উক্ত সংবিধানের ২২৩/২২৩ (এ) অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ এলাকা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়। সর্বোপরি পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রযোজ্য ছিলনা। এটা ঠিক, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলেও মূলতঃ এটা ছিল একটা বহুজাতিক রাষ্ট্র । বাঙ্গালী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পাখতুন এবং বিভিন্ন পাহাড়ী জাতিসত্ত্বার সমন্বয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণের স্বতন্ত্র স্বত্তার স্বীকৃতি ছিল। যার কারণে পাহাড়ী জনগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রশ্নটি রাজনৈতিকভাবে কখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি । ১৯৬৩

সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংশোধনী আনা হয়। তম্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সংশোধনীও ছিল (১৯৬৪ সালের আইন নং ১)। যদিও পবিত্র শাসনতন্ত্রের ২২৩/ ২২৩(এ) অনুচ্ছেদে পরিস্কার উল্লেখ ছিল, পুরো কিংবা আংশিকভাবে কোন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশেষ ব্যবস্থার বিলোপ বা কোন বিশেষ অধিকার সম্পূর্ণ বা আংশিক সংশোধনীর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে সেই এলাকার জনগণের মতামত নেবেন কিন্তু পবিত্র শাসনতন্ত্রের উপরোক্ত অনুচ্ছেদ এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় বরখেলাপ ঘটে । যদিও আন্তর্জাতিক চাপ এড়ানোর জন্য পাকিস্তান সরকার ১৯০০ সালের রেগুলেশানের অন্যান্য মূল ধারা ও নিয়মবিধি অপরিবর্তিত রাখে, কিন্তু নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বোধ ছিল ক্ষণস্থায়ী।

পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে সত্তরে বাঙালী জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। জাতীয়তাবাদ আসলে এক ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ ও দীক্ষা। জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক জাতির স্ব-শাসন সহ স্বাধীন ভাবে বসবাস করার অধিকার আছে। উপজাতি, গোষ্ঠি, নগর রাষ্ট্র, সামন্তপ্রভু, ধর্ম ইত্যাদির স্তর পেরিয়ে মানুষ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। আধুনিক জাতীয়তাবাদের উম্মেষ ১৫০ বৎসর আগে। কোন জাতি অন্যদেশ ও জাতির অধীনে থাকলে কিংবা চাপ বা হুমকির কবলে থাকলে জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দেয়। একটি ভুখন্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির মধ্যে ধর্ম, ভাষা, গোত্রের প্রভেদ দেখা দিলেও জাতীয়তাবাদী চেতনা মাথাচাড়া দেয়। অনেক জাতীয়তাবাদী শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। তারা সংসদের মত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের চেষ্টা চালায়। যা বর্তমানে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রকট আকার ধারণ করেছে। যেমনটি চেয়েছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীরা। প্রত্যেক শাসকই সাধারণতঃ জাতীয়তাবাদীদের আইন শৃংখলা লংঘনকারী হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। পাকিস্তান আমলেও বাঙালীরা এ ধরনের আচরণের স্বীকার হয়েছিল। যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলতঃ ইসলামের দোহাই দিয়ে। পাকিস্তান ইসলামীকরণের নামে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ভাষা বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। চেয়েছিল লিঙ্গুয়াফ্রাংকা হিসাবে উর্দূর প্রাধান্য রেখে উর্দূ বাংলার মিশ্রণে একটি ভাষা চালু করতে। এটা কারো অজানাা নয় যে, ফরাসী বিপ্লবের ভেতর দিয়ে উত্থিত চিরায়ত বুর্জোয়ারাই ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে উৎখাত করেছিল। রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র একান্তই ইহজাগতিক প্রসঙ্গ। এগুলো কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করবে ইহজাগতিক মানুষ, ধর্ম নয়। যদিও শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে সাংবিধানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। ফলে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে ইতিহাসের মানচিত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে ।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র তখনও রচিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে স্বতন্ত্র এলাকা হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার দাবী জানিয়েছিল। তাদের দাবীর প্রত্যুত্তরে তৎকালীন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান বলেন, অখন্ড জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র জাতির অস্তিত্ব না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তিনি বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে তাদের মিশে যেতে পরামর্শ দেন। জাতিভিত্তিক বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার পর 'জাতীয়তাবাদী' কার্যক্রমের মধ্যে তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক তফাৎ একথা তিনি বুঝতে ব্যর্থ হন। কারণ পাহাড়ীরা জাতিগতভাবে বাঙালী নয়। তদুপরি বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিতর পাহাড়ীদের স্বার্থ কি করে অক্ষুণ্ণ থাকবে তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা তৎকালীন শাসক.গোষ্ঠী দিতে পারেননি। ফলে আমরা বাঙালী নই- এই আন্দোলন পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎস ভুমি খুঁজে

পায়। অতঃপর জুম্মজাতীয়তাবাদ নামে আরও একটি নতুন জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। আর এই জুম্ম জাতীয়তাবাদের এলাকা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। ফলে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পার্বত্য জাতিস্বত্ত্বাসমূহ প্রথম বারের মত বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতের মধ্যে নিজেদের আত্মপরিচয় তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সমস্যায় নিপতিত হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতিসত্ত্বাসমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৪৮ এর আওতায় সরকার ১৯০০ সালের পার্বত্য শাসন বিধি পার্বত্য প্রশাসনের প্রয়োজনে বহাল রাখে। যদিও সরকার তার নিজস্ব স্বার্থে নোটিফিকেশান নং-এস.আর.ও ৭২-এল/৭৯ তারিখ ঃ ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯ ইং মূলে উপরোক্ত শাসনবিধি ব্যাপক সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করেছে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও যুগের সাথে সংগতি রেখে কোন সরকারই উপরোক্ত শাসন বিধি সংশোধন, সংযোজন ও যুগোপযোগী করে হেফাজতের জন্য কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি। দ্রুত পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেয়। প্রত্যেক সামরিক সরকারই পাহাড়ী জনগণের সমস্যা সামরিক উপায়ে সমাধানের পাশাপাশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পাহাড়ী জনগণকে ধ্বংস করার বা সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য বৈদেশিক আর্থিক সহায়তায় সরকারী উদ্যোগে ব্যাপক হারে বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজনকে এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন এবং পাহাড়ী জনগণকে ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদমূলক অভিযানের অনুরূপ শিকার হয়েছে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা, চীনে তিব্বতীরা, শ্রীলঙ্কার তামিলরা, ভারতে অসমিয়ারা, ইসরাইলে প্যালেষ্টাইনীরা আর বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীরা; যারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে মনে করে তাদের মাতৃভূমির শেষাংশ। সেই শেষ আশ্রয়ে যখন বৈদেশিক অর্থায়নে সরকারী উদ্যোগে অনুপ্রবেশ শুরু হয়- তখন পাহাড়ীরা স্বাভাবিক কারণে আক্রমণমূখী হয়ে ওঠে। ১৯৮০ সালে তৎকালীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য 'উপদ্রুত এলাকা বিল' সংসদে পেশ করে - যদিও বিরোধী দলের চাপের মুখে তৎকালীন সরকার বিলটি সংসদে পাশ করাতে পারেনি। যার কারণে পাহাড়ীরা তাদের ভাগ্যের মিল দেখতে পায় চিলির মাপুচে জনগোষ্ঠির সংগে। চিলির সামরিক সরকার ১৯৭৯ সালে ডিক্রি ল- ২৫৬৮ জারি করে। এই আইন বলে মাপুচে জনগোষ্ঠির সম্প্রদায় ভিত্তিক জমির মালিকানাসত্ত্ব বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এই আইন ছিল এথনোসাইডের মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠিকে পৃথিবী থেকে মুছে দেয়ার সরকারী নির্দেশ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের ভুল নীতি ও ভুল পদক্ষেপে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে পাহাড়ী জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে পাহাড়ী জনগণের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারান্টি দিয়ে কোন সরকারই তাদেরকে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেনি। যার কারণে পাহাড়ী জনগণের একটা বিরাট শিক্ষিত অংশ দেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তাদের অধিকার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন সম্ভব নয় ভেবে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সামরিক সংগঠন 'শান্তি বাহিনী' গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। জনসংহতি সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল পাহাড়ী জনগণের ঐতিহাসিকভাবে অর্জিত অধিকারসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায় এবং তা বাস্তবায়নের দাবী মেনে নিতে বাংলাদেশ সরকারকে বাধ্য করা। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক চাপের মূখে সামরিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য হয়। শুরু হয় জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের রাজনৈতিক আলোচনা। ১৯৮০ সালের ৪ঠা মে তারিখে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটির বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি নতুন জেলায় বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়। সামরিক সরকারের লক্ষ্য ছিল- অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী নেতৃত্বের অভিন্ন ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা। তারই অংশ হিসাবে ১৮৩৬ সালের জেলা আইনের আওতায় ১৯৮১ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ নং ED(JA-(11)(III)/80-170) মূলে বান্দরবান পার্বত্য জেলা, ১৯৮৩ সালে ১৩ই অক্টোবর ED (JALL/76/83-348) মূলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এবং ১৯৮৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ME (JA(11) 264/83-49) মূলে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সৃষ্টি হয়। THE DISTRICTS (EXTENSION TO CHITTAGONG HILL TRACTS) ORDINANCE 1984. ORDINANCE NO- LXXI OF 1984. এর আওতায় বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসমূহকে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি (ACT V OF 1898) এর কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য শুধুমাত্র আইনগত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এক পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির সংগে সামরিক সরকারের রাজনৈতিক আলোচনা ভেংগে গেলে ১৯৮৮ সালে সামরিক সরকার তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের সংগে পৃথক পৃথক ভাবে তিনটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করেন এবং সংবিধানের ৯, ১১, ২৮ (৪) অনুচ্ছেদের আওতায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে ১৯৮৯ সালের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন প্রণয়ন করে ১৯৮৯ সালে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করেন। উপরোক্ত আইনে পরিষদে পাহাড়ী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ধরা যেতে পারে, এই পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সামরিক সরকারের প্রথম পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক সমাধানের প্রথম মাইল ফলক। জাতীয় সংসদে পাশকৃত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের আনুষ্ঠানিক কার্যকারিতা শুরু করার স্বার্থে ১৯৮৯ সালে ১৬ নং আইনের মাধ্যমে ১৯০০ সালের পার্বত্য শাসন বিধিকে রহিতকরণ করা হয়। পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) মন্ত্রণালয়ের বিকা (কল্যাণ) ম-৭(৯)/৯০(প্রঃ)/২৭ তারিখ ২৯/১০/৯০ ইং স্বাক্ষরিত স্মারকের আদেশ মতে এখনো ১৯০০ সালের পার্বত্য শাসন বিধি পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ আছে। অন্যদিকে সরকার পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রণয়ন ও গঠন করলেও এখনো পর্যন্ত ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ১(২) নং ধারার বিধান মতে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যকারিতা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেনি।

প্রশাসনিক ক্রম বিকাশ

প্রতিম রায় পাম্পু এডভোকেট

স্বাধীন ও সার্বভৌম এই বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলই একমাত্র এলাকা যে অঞ্চলে প্রায় দুই শত বৎসর ধরে প্রচলিত নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমগ্র বাংলাদেশে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ব্যতিক্রম। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শাসকবর্গ, তথা সাম্রাজ্য বা বৃহত্তর রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলের বিশেষ ঐতিহ্য ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মেনে এসেছে। এই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসন সব সময় ছিল কম-বেশী শিথিল। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পর এই অঞ্চল সরাসরি বৃটিশ ভারতের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। প্রশাসনের সার্বিক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট নিয়োগ করা হয়। নতুন এই জেলায় কার্যক্রম শুরু হওয়ার সাত বছর পর ১৮৬৭ সালে জেলার শাসনকর্তার নাম সুপারিনটেন্ডেন্ট থেকে পরিবর্তন করে ডেপুটি কমিশনার করা হয়। ১৮৭০ সালে Government of India Act. পাশ করে বিশেষ অঞ্চল শাসনের জন্য যেসব বিধি নির্দেশ ইতিপুর্বে তৈরী করা হয়, তা অনুমোদনের জন্য গভর্ণর জেনারেলকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এর ফলে ব্যাঙ্গালোর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আরও বহু অঞ্চল এর অর্ন্তভুক্ত হয়। ১৮৯৯ সালে বর্তমান ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাইহিল বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনিক গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পায়। তখন বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের শাসনাধীনে একটা স্বতন্ত্র মহকুমায় রূপান্তর করে একজন সহকারী কমিশনারের নিকট শাসনভার ন্যস্ত করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বৃটিশরা মিজোরামে লুসাই বিদ্রোহ দমনের জন্য মূলতঃ ১৮৮১ সালে চিটাগাং হিলট্রেক্টস ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশান এর আওতায় এই অঞ্চলের পাহাড়ী জনগণ থেকে রিক্রুট করা পুলিশ বাহিনী গঠন করেছিল। যারা লুসাই বিদ্রোহ দমনে বৃটিশ বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

বৃটিশ সরকার তার রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ১৮৮৪ সালে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে ৫টি রাজস্ব সার্কেলে বিভক্ত করে। যথা ঃ ১। চাকমা রাজস্ব সার্কেল, আয়তন ১৬৫৮ বর্গমাইল (৭৬৩ বর্গমাইল, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়া) ২। বোমাঙ রাজস্ব সার্কেল, আয়তন ১৪৪৪ বর্গমাইল (৬২০ বর্গমাইল, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়া) ৩। মঙ রাজস্ব সার্কেল, আয়তন ৬৫৩ বর্গমাইল ৪। সদর মহকুমার খাস মহল ৫। সাংগু মহকুমার খাস মহল (গেজেটিয়ার পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃষ্ঠা -২৩৯-৪০) ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য অঞ্চলে বলবৎকৃত সকল নিয়মাবলীর সমন্বয়ে এই পার্বত্য অঞ্চল শাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা অনিবার্য হওয়ায় বৃটিশ সরকার নোটিফিকেশান নং ১২৩, পি. ডি তারিখ ঃ ১লা মে, ১৯০০ সাল অনুসারে "The Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 (Regulation No-1 of 1900)" নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় একটি নতুন আইন চালু করে এবং এই Regulation বলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পুনরায় জেলায় উন্নীত করা হয়। এই Regulation এর অধীনে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে ৩ রাজার নেতৃত্বে ১। চাকমা সার্কেল- চাকমা অধ্যুষিত জেলার মধ্য ও উত্তরাঞ্চল ২। বোমাং সার্কেল- মার্মা, ম্রো, কুকী অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চল ৩। মং সার্কেল - ত্রিপুরা অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চল নিয়ে ৩টি সার্কেলে বিভক্ত করে রাংগামাটি সদর, বান্দরবান ও রামগড় নামে ৩টি মহকুমা গঠন করা হয়। ৩টি মহকুমাকে আবার ৮টি প্রশাসনিক থানায় বিভক্ত করা হয়।

Map of Juao De Barros, Abdul Karim, 1550 A.D.

প্রাচীন বাংলা ও আরাকানের একটি মানচিত্র

জোয়াও ডে বারোজ অঙ্কিত সন ১৫৫০ খ্রীঃ)

রাজস্ব বিভাগীয় হিসাব ১৮৭৫ খ্রী:

সার্কেল বা মহাল	আয়তন	লোক সংখ্যা									
	বর্গমাইল	চাকমা	মঘ	ত্রিপুরা	কুকি	বাঙ্গালী	খুমি	বনযুগী	খিয়াং	ম্রো	মোট
১ রাজা হরিশ চন্দ্র রায়ের অধীন সদর চাকমা সার্কেল	৯৮৬	২২০০০	১১০০	৩০০	১৫০	৮০০	-	-	-	-	২৪৩৫০
২. মাং রাজা নরপতির অধীন মাং সার্কেল	৫৫৪	৩০০০	৩০০০	৭৫০০	-	৬০০	-	-	-	-	১৪১০০
৩. জেলা প্রশাসকের অ[illegible] সদর খাস মহাল	১০০৭	৫০	-	১৫০	১৫০	-	-	-	-	-	৩৫০
৪. সহকারী কমিশনারের অধীন শঙ্খ খাস মহাল	৬২৬	-	-	-	-	-	১২১০	-	-	-	১২১০
৫. বোমাং সদস্যদের অধীন শঙ্খ সার্কেল	৫৭৫	৬০	৭৫০০	৪০০	-	৮০০	৭০	৪০০	১২০	২৪০	৯৬০০
৬. ঐ --- রুমা সার্কেল	২৫৪	-	৩২৪০	-	-	-	৩০০	-	-	-	৪১৪০
৭. ঐ --- মাতামুহুরী সার্কেল	৫৯৪	-	৩৯০০	৬০০	-	৫০০০	-	-	-	১৯০০	১১৪০০
মোট = %	৪৫৯৬	২৫১১০ ৩৮.৫২%	১৮৭৫০ ২৮.৮৭%	৮৯৫০ ১৩.৮৩%	৩০০ ০.৪৫%	৭২০০ ১১.১৫%	১৫৮০ ২.৩৭%	৪০০ ০.৬০%	১২০ ০.১৬%	২৭৪০ .০৫%	৬৫১৫০ ১০০%

বি: দ্র: এই হিসাবে চট্টগ্রামের কক্সবাজার ও মিজোরামের দেমাগীরি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

সূত্র : উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা রাঙ্গামাটি ২য় সংখ্যা, জুন ১৯৮৪ তে লিখিত; উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের প্রয়াত ডাইরেক্টর বাবু সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ . পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজস্বের ইতিহাস। (ছকটি লেখক কর্তৃক সজ্জিত)

৩৪ পৃষ্ঠার পর

১৭৮৪ খ্রীঃ সালে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক, আরাকান রাজ্য দখল ও তথায় অনুষ্ঠিত উৎপীড়নের ফলে সে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসে। তখন উদ্বাস্তু আরাকানীরা স্বদেশ উদ্ধারের জন্য অভিযানও চালাতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীঃ সাল পর্যন্ত আভা সরকার ও বিদ্রোহী আরাকানীদের মাঝে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষগুলো উদ্বাস্তু আগমনকে আরো বাড়িয়ে তুলে, এবং তাতে বার্মা ও বৃটিশ উভয় সরকারের মাঝে তিক্ততা চরম আকার ধারণ করে। ঐ সালেই উভয়ের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং আরাকান বৃটিশদের দখলিভূত হয়ে, ভারতের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়। তখনকার ঐ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু আরাকানীদের দীর্ঘ অবস্থানের কারণে, আশ্রয়দাতা দেশই তাদের স্থায়ী বাসস্থান হয়ে দাঁড়ায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালীরা পটুয়াখালীর মগ ও কক্সবাজারের রাখাইনরা, সেই তাদেরই বংশধর। চাকমারাও সেই উদ্বাস্তুদের একটি অংশ।

ক) মিঃ লুইন ঘটনা প্রবাহ এভাবে বর্ণনা করেন যথাঃ

These letters were received during the administration of Lord Cornwallis. They were followed up almost immediately by the entrance into our territory of a force of armed Burmese under the Sirdar of Arracan. The Chief of Chittagong in the same month of june, writes to the Governor General in Council, reporting this incursion and stating that he has declined to respond to the overtures of alliance until this armed force was withdrawn. At the same time he states that in his opinion the refugees should be driven out of British territory. He adds, also that these fugitives were persons of some consequence in Arracan, and reports, further, that a chakma Sirdar, who had flied from Arracan, had been arrested and confined by him. He concludes by stating his opinion that this Sirdar and his tribe have no intention of cultivating the low lands in a peaceable manner but have taken up their abode in the hills and jungles for the convenience of plundeing. Ten years before this in the year 1777, it appears from a letter dated 31st May, from the Chief of Chittagong to the Honourable Warren Hasting Governor General that some thousands of hill men had come from Arracan into the Chittagong limits, having been offered encouragement to settle by one Mr. Bateman, who was the chief governing officer there at that time. These migrations were evidently for a long time a rankling sore to the Burmese authorities and Macfarlane's History of British India, page 355, records that in 1795 a Burmese army of 5,000 men again pursued some rebellious

chiefs or as they called them robbers right into the English District of Chittagong. These Chiefs who had taken refuge in our territories were eventually given up to the Burmese and two out of the three were put to death with atrocius tortures.

In 1809 Macfarlane records that disputes continued to occur in the frontiers of chittagong and Tipperah, but the organized forays into that territory hardly assumed any narrative definite form until 1823 (Wilson's The Narrative of the Burmese War page 25), when a rupture ensued, which led to the war of 1824. The primary cause, therefore, of all these disturbence, rendering the Burmese apt to provoke and take offence, was undoubtedly the emigration to our hills of tribes hitherto subject to their authority.

The origin of the tribes is a doubtful point. Pemberton ascribes them a Malay descent. Colonel Sir A. Phayre considers two of the principal tribes of Arracan, who are also found in these hills to be of Myamma or Burmeses extraction. Among the tribes themselves no record exists, save that of oral tradition as to their origin. The Khyoungtha alone are possessed of a written language, They have among them several copies of the Raja wong, or History of the Kings of Arracan, but I have been able to discover no records whatever as to their sojourn and doings in the hills. The Tongtha, on the other hand possess no written character, and the languages spoken by them are simple to a degree expressing merely the wants and sensations of uncivilized life. The information obtainable as to their origin and past history is therefore naturally meagre and unreliable (Page 32/33).

বাংলাঃ "এই চিঠিগুলো লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে পাওয়া গেছে। এগুলো পাওয়ার পর প্রায় সাথে সাথেই আরাকানের সর্দারের পরিচালনাধীন একদল সশস্ত্র বর্মী সৈন্য আমাদের শাসনাধীন এলাকায় ঢুকে পড়ে। আমাদের চট্টগ্রামের প্রধান ঐ একই জুন মাসে বাধ্য হয়ে বড় লাটের উদ্দেশ্যে এই আক্রমণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এটা লিখে পাঠান যে, তাকে সন্ধি ও সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাড়া দিবার সুযোগই দেওয়া হয়নি, যদ্দরুন আগে সশস্ত্র সৈনিকদের প্রত্যাহার দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, শরণার্থীদের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে অবশ্যই তাড়িয়ে দিতে হবে। তাতে এটাও যোগ করেন যে, উক্ত পলাতক লোকজন আরাকানে বহুবিধ দুকর্ম অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জনৈক চাকমা সর্দার যিনি

আরাকান থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাকে তিনি নিজেই গ্রেফতার করে ধরে রেখেছেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করে স্বীয় বক্তব্য শেষ করেন যে, উক্ত সর্দার ও তার পরিচালনাধীন উপজাতীয় লোকদের নীচু সমতল ভূমিতে শান্তিপূর্ণ চাষাবাদেও আগ্রহ নেই। তারা ইতিমধ্যে পাহাড়ে ও বনে আস্তানা গড়ে নিয়েছে, যাতে লুট পাট করার সুবিধা হয়। এর দশ বছর আগে ১৭৭৭ খ্রীঃ সালের ৩১ মে তারিখের আরেকটি চিঠি যেটি চট্টগ্রামের তদানিন্তন প্রধান কর্তৃক সম্মানিত বড় লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তাতে আছে, কয়েক হাজার পাহাড়ী লোক আরাকান থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে। তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্ববর্তী প্রধান প্রশাসক মিঃ বেটম্যান কর্তৃক পুনর্বাসন দানের আশ্বাসে উদ্দীপ্ত। দেশ ত্যাগের এ জাতীয় প্রামাণ্য ঘটনাবলী বর্মী কর্তৃপক্ষের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিল। মেকফার্লেন লিখিত ইতিহাস পুস্তক বৃটিশ ইন্ডিয়ার ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে, ১৭৯৫ খ্রীঃ সালে আরেকবার ৫০০০ বর্মী সৈন্যের একটি বাহিনী কিছু বিদ্রোহী উপজাতীয় সর্দারকে, যাদেরকে তারা ডাকাত বলে, ধাওয়া করে বৃটিশ অধিকারভুক্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে হানা দেয়। আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারী ঐসব সর্দারদের কয়েকজনকে তখন বর্মীদের কাছে হস্তান্তর করাও হয়। তখন তাদের মোট তিনজনের দু'জনকে ভীষণ উৎপীড়নের দ্বারা মেরে ফেলা হয়।

মেক ফার্লেন আরো উল্লেখ করেন, ১৮০৯ খ্রীঃ সালেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার সীমান্তে বিরোধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ সালের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত ঐসব সংঘাত সংঘর্ষ কমই সফলকাম হতে পেরেছে বা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। (উইলসন্স লিখিত 'নেরেটিভ অফ দি বার্মিজওয়ার' পৃষ্ঠা ২৫)

ঐ সময় সংঘটিত ঘটনাবলী ১৮২৪ সালের যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলে। দেখা যায় এসব অশান্তির সূচক হলো এমন একটি কারণ, যা বর্মীদের ধৈর্য্যচ্যুত আর দোষ গ্রহণে বাধ্য করে। নিঃসন্দেহে সে কারণটি হলোঃ উপজাতীয় লোকদের স্বদেশ ত্যাগ করে, আমাদের পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ, যা তাদের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত।

উপজাতীয় মৌলিকত্বের ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ। পেম্বারটন তাদেরকে মালয়ী বংশোদ্ভূত বলে নির্ণয় করেন। কর্ণেল স্যার এ ফেইর অনুমান করেন, আরাকানের প্রধান যে দুটি উপজাতি, যাদের অনেককে এই পাহাড়াঞ্চলেও পাওয়া যায়, তারা মূলতঃ মায়াম্মা বা বর্মী লোকোদ্ভূতই হবে। উপজাতীয়দের নিজেদের মৌখিক পুরাকাহিনী ব্যতীত মূল তথ্য বৃত্তান্তের কিছুই লিপিবদ্ধ আকারে প্রাপ্তব্য নয়। খিয়াংথা পরিচিত লোকদেরই কেবল লিখিত ভাষা আছে। তাদের কাছে বহুসংখ্যক রাজাওং বা আরাকানের রাজাদের ইতিহাস নামক পুস্তিকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমি তাদের প্রবাস ও পর্বতবাসের জীবন বৃত্তান্তের উপর কোন তথ্যই অবগত হতে পারিনি। অপর পক্ষে টংথা নামীয়রা কোনরূপ লেখশৈলীর অধিকারী নয়। তাদের কথাবার্তা হলো কোনমতে চাহিদাকে ব্যক্ত করা যা অসভ্য জীবনের অভিব্যক্তি। তাদের মৌলিকত্ব আর অতীত ইতিহাসের তথ্য স্বভাবতই অপ্রতুল আর অবিশ্বাস্য। (সূত্রঃ ঐ পৃঃ ৩২/৩৩)।

খ) মিঃ বি আর পার্নের উদঘাটিত তথ্যটি এবার প্রণিধানযোগ্য যথাঃ

Thirteen years before, at the time of the Mogh migrations of 1798, an Arakanese chief who was known to the English as "Moorusugeeree" had fled into Chittagong, followed by many adherents for he had been popular with his people. It was he who had invited King Bodawpay to seize the crown of Arakan, but he had quarrelled with the Burmese and had settled, with the permission of the company's officers at Harbang. The English knew him as "Moorusugeeree", which they thought was his name, whereas it is evidently the title "Myothugyi". His real name was Nga Than De. He had a son named Chin pyan, who was called by the English "King Bering" or "King Burring" Chin pyan's own account of his father and of himself is as follows.

In 1145 Mogh the country of Arakan was over run with plunderers. In consequence my father addressed a letter to the King of Ava, who sent an army and took possession of Arakan. The King looking on my father as a person of royal blood, put him in possession of the Government of Arakan, retaining only the name of sovereign to himself. In 1160 (Mogh) the said King demanded from my father a quota of 20,000 muskets and 40,000 men to make war on Siam. My father consented to furnish the half of this demand. The King was angry at not getting the whole, and seized my brother and killed him. On this account my father with his relatives and friends, and all his adherents consisting of most of the inhabitants of that country, emigrated. My father died. We sought refuge in the English territory, and I concealed myself at Harbang. Mr. Cox at this time came to Ramoo by order of the Government and distributed food and implements for cutting the jungles to all the Mogh. They cultivated the ground and thus earned a subsistence Mr. Cox made every search for me, but through the operation of my civil destiny he did not find me. After the death of my father my mother took every thing he possessed. I got nothing.

Chin Pyan's father had apparently before he fled to Harbang owned an area of land near the banks of the Naaf river, which formed the boundary between Indian and Burmese territory. This land derived from its owner the name of "Moorusugeeree." When he fled from Arakan, Nga Than De had abandoned his property, but early in the year 1811 chin pyan left Harbang and took possession of it, professing to act as agent for a Mohammedan, "Saddodeen Chaudry, who had induced the Collector of Chittagong to give him documentary recognition of his ownership, although, it would appear, the Collector did not know exactly where the land was.

(Ref: Journal of Burma Research Society the King Bering page 44/48) Dated 23.11.1933.

বাংলাঃ "মগদের ১৭৯৮ খ্রীঃ সালে অনুষ্ঠিত স্বদেশ (আরাকান) ত্যাগের তের বছর আগে একজন আরাকানী সর্দার, যিনি "মুরুসুগিরি নামে ইংরেজদের কাছে পরিচিত ছিলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। বহু সংখ্যক অনুসারী ও তার সঙ্গী হয়। তিনি নিজের ঐ জনগণের মাঝে জনপ্রিয় ছিলেন। বার্মার রাজা বোদাওপায়াকে আরাকানের সিংহাসন দখলের জন্য তিনিই আহবান করে আনেন। তবে তিনি বর্মীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন, ফলে (ইষ্ট ইন্ডিয়া) কোম্পানীর কর্মকর্তাদের অনুমতিক্রমে হারবাং অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। ইংরেজরা তাকে মুরুসুগিরি হিসাবেই জানতো, যা তার নাম বলেই তাদের ধারণা ছিলো। অথচ এ প্রমাণ আছে যে তাঁর উপাধি ছিলো মাইয়োথুগ্যি আর আসল্ নাম ছিলো নগো থান দে। চীন পিয়াঁ নামীয় তার একজন ছেলে ছিলো, যাকে ইংরেজরা রাজা বেরিং বা বারিং নামে ডাকতো। চীন পিয়াঁর নিজের বর্ণনায় তাঁর বাবা ও নিজের কাহিনী নিম্নরূপঃ

: ১১৪৬ মঘী সনে (১৭৮৪ খ্রীঃ) আরাকান দেশটি অরাজক লোকদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে, সে পরিস্থিতিতে, আমার বাবা আভার রাজাকে একখানা চিঠিতে আহবান করেন, যিনি একদল সৈন্য পাঠিয়ে আরাকান দখল করে নেন। রাজা আমার বাবাকে রাজরক্তের অধিকারী দেখে আরাকান সরকারের প্রাধান্য দান করেন, এবং নিজের অধিকারে শুধু সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাই রাখেন। ১১৬০ মঘী সনে (১৭৯৮ খ্রীঃ) শ্যাম দেশের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজা আমার বাবার কাছে ২০,০০০ বন্দুক ও ৪০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী চেয়ে পাঠান, তা'তে তিনি অর্ধেক পর্যন্ত দাবী পূরণের সম্মতি ব্যক্ত করেন। পরিপূর্ণ দাবী পূরণ না হওয়াতে রাজা রুষ্ট হোন, ও আমার ভাইকে আটক এবং হত্যা করেন। এহেতু বাবা নিজের সমূদয় স্বজন পরিজন ও অনুসারীদেরসহ স্বদেশ ত্যাগ করেন, যারা সংখ্যায় ছিলেন, সে দেশের গরিষ্ঠ অধিবাসী। বাবা মারা যান। আমরা ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ ও আমি নিজেকে হারবাং অঞ্চলে গোপন করি। মিঃ কক্স এ সময় সরকারের আদেশে রামুতে আসেন এবং মগ বসতির ভিতর জঙ্গল পরিষ্কারের সরঞ্জাম ও খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করেন। তারা জমিগুলোতে চাষাবাদ শুরু ও তাতে জীবিকার সংস্থান করে নেয়। মিঃ কক্স গভীরভাবে আমার

অনুসন্ধানে লিপ্ত হোন। কিন্তু আমার প্রকাশ্য আস্তানার সন্ধান ও আমার সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হোন। আমার বাবার মৃত্যুর পর, তার পরিত্যক্ত সব কিছুই আমার মা নিজে হস্তগত করে নেন। আমি তার কিছুই পাই নি।

"হারবাং অঞ্চলে পলায়নের আগে নাফ নদীর তীরে চীন পিয়াঁর বাবার বিশুদ্ধ মালিকানাধীন এক খন্ড ভূসম্পত্তি ছিলো, যা-ভারত ও বার্মার মধ্যবর্তী সীমান্ত চিহ্নিত করে। এ জায়গাটি তার মালিকের পরিচয় বহন করে একই মুরুসুগিরি নামে অভিহিত হতো। আরাকান ছেড়ে আসার সময় নগো থান দে ঐ জায়গাটিও পরিত্যাগ করেন। ১৮১১ খ্রীঃ সালের শুরুতে চীন পিয়াঁ হারবাং ত্যাগ করে, এই বলে এ জায়গাটির দখল নেন যে, তিনি জনৈক মুসলিম সাদুদ্দীন চৌধুরীর প্রতিনিধি, যিনি চট্টগ্রামের রাজস্ব কর্মকর্তাকে এ জমির মালিকানা দলিল অনুমোদনে বশিভূত করেন। যদিও মনে হয় ঐ রাজস্ব কর্মকর্তা জায়গাটির অবস্থান কোথায় তা সঠিকভাবে অবগত ছিলেন না।"

(সূত্রঃ জার্নাল অফ বার্মা রিসার্চ সোসাইটি পৃঃ ৪৪/৪৮ তাং ২৩/১১/১৯৩৩ খ্রীঃ)।

তৎপর মিঃ বি আর পার্ন, বর্ণিত চীন পিয়াঁ ও তার অসংখ্য অনুসারীদের দ্বারা বাংলার সীমান্ত অভ্যন্তরে ও আরাকানের গভীরে উপর্যুপরি অরাজকতা ও অভিযান পরিচালনা, তদ্দ্বারা বার্মা সরকারের সাথে সৃষ্ট ভূল বুঝাবঝি ও বিরোধের বর্ণনা প্রদান করেছেন। তাতে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুরুসুগিরি তথা মইসাগিরি, ও তার সাথে সম্পর্কিত চাকমা ও অন্যান্য জনসাধারণের মৌলিক আবাসক্ষেত্র বাংলাদেশ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি কালের কাছাকাছি সময় কালেও, যখন বৃটিশ শাসনের চার দশক সময়কাল প্রায় অতিবাহিত, তখনো বাংলাদেশ অঞ্চলে চাকমাদের আগমন নির্গমন অব্যাহত ছিলো। অতএব এটা সন্দেহাতীত যে, চাকমা ও তাদের সঙ্গীসাথী উপজাতিরা আসলে বিদেশী বংশোদ্ভূত, যাদের অন্যতম আবাসস্থল হলো আরাকানের মুরুসুগিরি বা মৎস্যগিরি। গিরি পদবিটিও তাদের প্রাচীন রাজা বিজয়গিরি সূত্রে প্রাপ্ত।

আতিকুর রহমান

প্রকাশিত বই :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (গবেষণা কর্ম)

২. প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট

৩. শান্তি সম্ভব

৪. প্রতিবেদন গুচ্ছ

৫. পার্বত্য তথ্য কোষ ১০ খণ্ড

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

যোগাযোগ : ৪৮ সাধার পাড়া উপশহর সিলেট। মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮

মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য হইবে। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে জারীকৃত মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, দণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে জনসংহতি সমিতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকা দিতে পারে।

সমিতির মতামত ঃ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং বিনা শর্তে মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করার সরকারী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত সমিতির সদস্যদের তালিকা প্রদানকরণ পদ্ধতি বহির্ভূত।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপে জড়িত করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যদি কাহারও কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট থাকে অথবা কাহারো অনুপস্থিতে কোন বিচার নিষ্পন্ন হইয়া যায় তাঁহা হইলে বিনা শর্তে সেই সব মামলা, অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারো বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ এই প্রস্তাবটি ৪ (১) (খ) অংশেরই পুনঃরুক্তি।

সমিতির মতামত ঃ সরকারের বক্তব্য যথাযথ নহে। কারণ জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপে জড়িত করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট রহিয়াছে অথবা যাহার অনুপস্থিতিতে বিচার নিষ্পন্ন হইয়াছে সেই সব স্থায়ী বাসিন্দাদের সম্পর্কে জনসংহতি অবহিত থাকা সম্ভবপর নয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা, অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট এবং সকল বিচারের রায় বাতিল করা হইল - এই মর্মে সরকারের তরফ হইতে একটি ঘোষণা প্রদানকরণ অপরিহার্য।

(২) (ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা।

সরকারের বক্তব্য ঃ বিসিএস সহ সকল ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে এবং সকল নন-গেজেটেড পদে উপজাতীয়দের জন্য কোটা সংরক্ষিত আছে। তবে প্রতিরক্ষা সার্ভিস যেহেতু সম্পূর্ণ যোগ্যতা ও মেধা ভিত্তিক, সেখানে কোটা সংরক্ষণ সম্ভব নয়।

সমিতির মতামত ঃ প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও জুম্ম জনগণের জন্য কোটা সংরক্ষণ রাখা বাঞ্ছনীয়।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা লাভের সুযোগ প্রদান করা।

সরকারের বক্তব্যঃ বিশ্ববিদ্যালয়/প্রকৌশল/মেডিক্যাল/ক্যাডেট কলেজে উপজাতীয়দের জন্য বিশেষ আসন সুবিধা ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ মেধার উপর নির্ভরশীল।

সমিতির মতামত ঃ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ মেধার উপর নির্ভরশীল হইলেও জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সুযোগ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, প্রকৌশল, ক্যাডেট ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। কেননা এই ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের ভূমিকা